

ইহন্ বোয়ারের এ পিল্‌গ্রামজ্

অনুবাদক :

শ্রীঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভারতী পাবলিশাস্
৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ

১৯৫৩

প্রকাশক :

শ্রীবিভাসিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভারতী পাবলিশাস'

৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট :

শ্রীব্রজ রাঘবোদ্যুরী

যুগ্মক :

শ্রীভবেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস

১ কণওয়ারিস্ ট্রিট,

কলিকাতা—১২

দু'টাকা চার আনা

* দু'টি কথা

নওউইজিয়ান সাহিত্যিক ইহন বোয়াব স্বনামধন্য সাহিত্যিক। তাঁর প্রতি প্রসিদ্ধ উপন্যাস “গ্রেট হাঙ্গার” ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় অনূদিত ও আদৃত হয়েছে। “এ পিন্ডুগ্রিমেক্স” উপন্যাসখানিও তাঁর সৃষ্টিশক্তির পরিচয় সুর্গোববে বহন করবে। এই উপন্যাসখানির অন্তর্বাদের দাবিই গ্রহণ করে কৃতার্থ বোধ করছি।

যে সাহিত্যে বিশ্বজনীন সুরটি ঝংকৃত হতে পারে তাই সংসাহিত্য। উপন্যাসে বর্ণিত বিষয়টি যদি দেশ-কালের অতীত সাবভৌমত্ব লাভ করবে তবে তাই তা’ অমর সাহিত্য বলে বিবেচিত হয়। বোয়াবেব উপন্যাসেব মধ্যে এই বিশ্বজনীন আবেদন আছে। তিনি যে-সমাজের ‘চিত্র এঁকেছেন তা’ বস্তুতঃ নওউইজিয়ান সমাজের চিত্র হলেও তা’ সকল সমাজেব পক্ষেই সমান প্রযোজ্য।

বিদেশী সাহিত্যেব অনুবাদ অতি দুর্লভ কম। ভাষান্তরেব বিভবনায় মূল উপন্যাসেব অনেক রূপান্তর ঘটে। আবার ঘটনাংশেব প্রাঞ্জলতা বজায় রাখতে অনেকখানি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্যপ্ৰতী হয়ে পড়ে, ফলে মূল বসের আশ্বাদন হতে কিছুটা বঞ্চিত হতে হয়। তবে মূল বর্ণিতব্য বিষয়টি যদি অবিকৃত থেকে থাকে তবেই অন্তর্বাদক ক্রমাব দাবী উত্থাপন করতে পারেন।

বর্তমান উপন্যাসের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় এই যে, মানুষের জীবন জটিলতম গ্রন্থির সমষ্টি মাত্র। মানুষ নিয়্যাত-চক্রের দাসরূপে কাজ করবে যায। পাপকর্ম ই হোক আব পুণ্যকর্ম ই হোক—কোনটাত মানুষের উচ্ছাদীন ক্রিয়া নয়। মানুষকে অবস্থা-বিপাকে পাপ করতেও হয়,

(৭)

আবার পাপের ফলভোগও সে এড়িয়ে যেতে পাবে না। উহন যোয়ার
তাঁর অধঃপতিতা নাথিকা বেগিণাব জগ্রে সৰ্দাই তাঁর স্নেহকুণ্ঠেব স্থাব
উন্মুক্ত বেধেছেন। বিচাবদও আন্দোলনেব দায়িত্ব সাহিত্যিকেব নয়-
তাঁর প্রধান ভূমিকা সত্যজ্ঞতার ও সত্যশ্রষ্টাব।

৩১, সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা—২২
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৩

বিনীত
হুমায়ুন কাদর

জীবন-মৃত্যুর পারে
দেখা হবে বারে বারে

এক

ক্রিষ্টিয়ানা সহরের আকাশ ঝাঁটের প্রসুতিসদনটি অত্যন্ত নিরানন্দময় একটা দোতলা বাড়ীতে অবস্থিত যার হাতায় শ্রামলতার চিহ্ন মাত্র নাই। এই প্রাচীন বনেদী প্রতিষ্ঠানটির পেছনে বয়েছে সুদীর্ঘ দেড়শ-বছরের ইতিহাস। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হাজার হাজার প্রসুতি এ'টিকে সাময়িক আবাসস্থল হিসেবে দখল করেছে। দখল করেছে কেউ বা আনন্দে, আবার কেউ বা শ্রেচ্ছস লজ্জার সঙ্গে। ইট-কাঠ-চূণের বাড়ীটা যদি বাড়ায় হ'ত এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারত, তা'হলে ক্ষত মজার কথাই না প্রকাশ হয়ে পড়ত !

১৮৭৮ সালের মার্চ মাসের এক হাম্বোজ্জল প্রভাতে একজন মহিলা ও তাঁর স্বামী এই প্রসুতি-সদনের বর্হিদ্বারে এসে উপস্থিত হ'লেন এবং দরজা-সংলগ্ন মর্চে-ধরা হাতলটা ধরে নাড়া দিলেন। দরজাটি খুলে যেতে তাঁরা বৃক্ষহীন, নিরানন্দ বাগানটি পার হয়ে উঠেনে এসে উপস্থিত হ'লেন। বৃক্ষে ও কাদায় পাঁচপেঁচে উঠোনটির ওপর সূর্যকিরণ ছল্কে পড়ায় এক ধরণের সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। তার সঙ্গে হাসপাতালের গন্ধ মিশে গিয়ে এক অস্বাভাবিক উগ্র গন্ধে স্থানটিকে আমোদিত করে রেখেছে।

হাসপাতালের ভূতটি কোদাল হাতে আগন্তুকদের দিকে এগিয়ে এল। প্রফেসর কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই লোকটি বাঁ দিকের সারির একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে জানালে, প্রফেসর-সাহেব এই সময় সাধারণতঃ ষ্টুয়ার্ডের ঐ ঘরেই বসে থাকেন।

ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীকে উঠোনে অপেক্ষা করতে বলে, সেইদিকের সিঁড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে জানানেন যে প্রফেসর এইমাত্র ডক্টর-ইন-চার্জের ঘরে গেছেন। অত্য়দিকে, প্রধান বিল্ডিং থেকে একটু তফাতে যে লাল ইটের বাড়ীখানা, সেইটা দেখিয়ে দিয়ে ভূতটি বললে, “ডাক্তারের বাড়ী এটি।”—অগত্যা ভদ্রলোক আবার সেইদিকে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু তিনি খুব বিরক্তভাবে ফিরে এসে বললেন, “কি আপদ! প্রফেসর আবার নাকি এখন ছাত্রদের নিয়ে ওয়ার্ড দেখে বেড়াচ্ছেন।”

ভূতটি কোদাল ফেলে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে, “ঐ যে ঘরটা দেখছেন, তা’হলে ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।”—সদর দরজার ডানদিকে স্লেট-রঙের যে পাথুরে বাড়ীটা, সে সেইটা দেখিয়ে দিলে। ভদ্রলোকটি আবার গজ্ গজ্ করতে করতে সেইদিকে গেলেন। তাঁর স্ত্রী পূর্বের মতই উঠোনে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এবারে ভদ্রলোকটির ফিরে আসতে বেশ দেরী হ’তে লাগল।

অগত্যা তাঁর স্ত্রী অর্ধৈর্ষ্যভাবে উর্দোনে পায়চারি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার যে কি দাঁড়াবে এই ভাবনায় তাঁর সময় যেন আর কাটতেই চায় না! চল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে তাঁর। নিজের যে আর সম্ভাবনা হইবে, এ আশা তিনি প্রায় ত্যাগই করেছেন। তাই স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে স্থির করেছেন যে প্রসূতিসদনের একটি ছেলেকে তাঁরা দস্তক নেবেন। এখানকার অসংখ্য ছেলের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নেওয়াও যেমন সহজ হবে তেমনি সেটা একটা পুণ্যকাজও হবে। এই ভেবেই তাঁরা মন স্থির করেছেন। বছর খানেক পূর্বে প্রফেসরকে ঐ কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি বড় সুবিধে করে উঠতে পারেননি। কারণ প্রথমে কাজটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, কার্যকালে দেখা গেল ঠিক তা' নয়। প্রথমতঃ ছেলোটি সুস্থ-সবল হবে, দ্বিতীয়ত তার মায়ের স্বাস্থ্যও যেন ভাল হয় এবং তৃতীয়ত তাঁদের অন্যান্য সন্ত'গুলিও যেন ঠিক ঠিক পালিত হয়। এতগুলি ব্যাপারের যোগাযোগ ত আর সবদাই আশা করা যায় না। মাত্র গতকাল তাঁরা অধ্যাপকের চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছেন।

মহিলাটি ভেবেই চলেছেন :

এখন ঐ একরত্তি শিশুটি বোধ হয় ঐ জানালাগুলির কোন একটার পেছনে ঘুমিয়ে আছে। যাক্, আর কিছুক্ষণ বাদেই ত দেখতে পাওয়া যাবে। হয়ত সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে পারবেন

তাঁরা। কিন্তু যদি কোন মানসিক বিকার নিয়ে জন্মে থাকে ছেলেটি? তা'হলে?—দৃষ্টিস্থায় শিউরে উঠলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর চিন্তা ভিন্নমুখী হ'ল। ভাবলেন, পরের ছেলে কি আর সত্যিই আপন হয় কোনদিন? অজ্ঞাতকুলশীল একটি ছেলেকে নিজের করে নেওয়া ত আর সহজ নয়! কত কিছুই ঘটতে পারে। অন্ততঃ নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না।

মহিলাটি এমনি আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছেন। যে দরজা দিয়ে তাঁর স্বামী অদৃশ্য হয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে, সূর্যকিরণস্নাত উঠোনটিতে অস্থির পদচারণা শুরু করে দিলেন তিনি।

আকাশে কড়া রোদ উঠেছে। হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে কক্ষল আর সতরঞ্জগুলিকে বাইরে আনা হচ্ছে। দূরের ঐ জঙ্গলটির কাছে .নিয়ে গিয়ে ধূলা ঝাড়া হবে। সেই প্রাচীন, নিস্তরঙ্গ হাসপাতাল বাড়ীটার দেয়াল ভেদ করে এক ধরণের নিরানন্দ ওষুধে-গন্ধ সর্বদা ভেসে আসছে। ঐ রুদ্ধ জানালার অভ্যন্তরে সংঘটিত কত-শত বিবাদ-কাহিনীর বার্তাবহ সেই ঝাঁঝালো গন্ধটি।

দোতলার একটা ঘর থেকে হঠাৎ একটি শিশুকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, কান্না থেকে থেকে ভেসে আসছে। ভূত্যাটি বরফ ঢেকে যাওয়া একটা নর্দমা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করছিল। মহিলাটি সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “অমন করে কে কাঁদছে বলতে পার?”

ভূত্যাটির হাসি যেন আর থামতে চায় না! কোদালের দিকে

বুঁকে পড়ে, রোদের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে সে ত প্রশ্ন শুনে হেসেই খুন! বললে, “তা’ কি করে বলব? কামা ত এখানে অষ্টগ্রহর লেগেই আছে।”

সেই মুহূর্তে মহিলাটির স্বামী ফিরে এসে জানালেন, ডাক্তার তাঁদের জন্তে অপেক্ষা করে বসে আছেন। —

এইবার উঠোনটি জনশূণ্য হয়ে পড়ল। কোদালটাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে ভূতাটি কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। ছাদের আলসে থেকে বিন্দু বিন্দু জল চুঁইয়ে পড়ছে উঠোনে আর ছাদের জলপড়া পাইপ-এর ওপর বসে একটা ছোট্ট পাখী, তার হলুদে ঠোঁটটি আকাশের দিকে তুলে দিয়ে আনন্দের কল-কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে।...এমন সময় হাতগুটনো জামা পড়া একজন খাত্রী ছুটে বেড়িয়ে এসে ভূতাটির নাম ধরে ডাক-হাঁক শুরু করে দিলে। ওদিককার দরজায় ভূত্যের সাদা মাথাটা দেখা গেল। মুখখানা বেজায় ব্যাজার করে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, “ব্যাপারখানা কি শুনি?”

“ডাক্তার তোমাকে দশ নম্বরে ডাকছেন। খুব জল্দি!”

“বাবা,—কিছু যে মুখে দেবো, তারও কি জো নেই? বলি হঠাৎ কি এমন দরকারটা পড়ল শুনি?”

“একটা লাস বার করতে হবে।”

“ভালা বিপদেই পড়া গেল দেখছি।”—বলে গজ্ গজ্ করতে করতে ভূতাটি চলে গেল।

এতক্ষণে স্বামী-স্ত্রীকে পক্ষকেশ অধ্যাপকের সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় আলাপ করতে দেখা গেল। প্রফেসর শাস্তভাবে বললেন, “তা’হলে একটু ইয়ে—করার দরকার, কারণ আপনারা নিশ্চয়ই চান না যে মেয়েটি আপনাদের দেখে ফেলুক।”

উভয়ে একসঙ্গে—‘তা ত বটেই’, ‘তা ত বটেই’ বলে অধ্যাপককে সমর্থন করলেন। মহিলাটি বললেন, “ছেলেটিকে একান্ত নিজেব করে পেতে চাই। ছেলেটির মা যে যখন তখন ছুট করে গিয়ে হাজির হবেন, তা’ হবে না। অগ্ন্যাগ্ন আত্মীয়-স্বজনও যে এসে ঝাঁকরা বাধাবেন, সে’টি চলবে না।—মোট কথা, ছেলেটি যেন তার ছ’জন মাকে নিয়ে বিপদে না পড়ে ভবিষ্যতে।”

মাথা নেড়ে প্রফেসর জবাব দিলেন, “সে কথা সত্য। তা’হলে আপনাকে একটু অভিনয় কবতে হবে। দেখবেন বাচ্ছাটিকে দেখে নিজের পাঁটটাই ভুলে মেরে দেবেন না যেন!”

প্রফেসর তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। উঠোনটি পার হয়ে তাঁরা কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠেছেন এমন সময় মহিলাটি তাঁর হাতটি চেপে ধরে বললেন, “মেয়েটির কি নাম, কই, এখনও পর্যন্ত তা’ ত বললেন না?”

“তা এখনও জানতে পারিনি। কোন কথাই সে বলতে চায় না। তাকে আমরা সকলে ৪৭ নম্বরের বলেই ডাকি।”

“মেয়েটা শেষ পর্যন্ত বেঁকে দাঁড়াবে না ত?”

প্রফেসর একটু মুৰুব্বিয়ানার হাসি হেসে জবাব দিলেন, “দেখুন, এইসব মেয়েদের আমি বেশ চিনি। আশা করি

এতদিনে এটুকু অভিজ্ঞতা দাবী করবার সঙ্গত অধিকার আমার হয়েছে।”—তারপর অনেকটা যেন স্বগত উক্তি করলেন, “পৃথিবীর মধ্যে এইসব মেয়েরাই হচ্ছে সত্যিকারের দুঃখী। তবু দেখাই যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।”

স্বল্প-আলোকিত বারান্দা দিয়ে প্রফেসর তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। পর পর কতকগুলো নম্বর দেওয়া ঘর পার হয়ে তাঁরা চললেন। ওরই একটার বাইরে দাঁড়িয়ে অনাবশ্যক চড়া গলায় প্রফেসর বলে উঠলেন, “এ ঘরটাই বা আর বাকী থাকে কেন? এক নজর দেখেই নিন্ না।” আগন্তুক ছ’জন প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন।

ঘরটার ভেতর থেকে কেমন যেন একটা গুহুধে-মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এল। উত্তর-দুয়ারী বলে ঘরের ভেতরটা তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। ছ’দিকের দেয়াল ঘেসে লম্বালম্বি বসান মুখোমুখী ছ’সারি খাট। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে খাটের সব ক’টি অপরিচিত মুখই তাঁদের দিকে উৎসুক বিষ্ময়ে ফাল্ ফাল্ করে চেয়ে আছে। ছ’তিনটি শিশু একসঙ্গে কেঁদে উঠতেই মায়েরা তাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। সব ক’টি প্রসূতিই সত্ত্ব কষ্টের তাড়নায় কেমন যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে।

দরজার কাছে একজন প্রসূতি বেশ পরিপাটি করে সেজে খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। আগন্তুকদের দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠল। প্রফেসর তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার ছেলেটি কোথায়?”

মেয়েটি গান্ধা-গোন্ধা, তামাতে মুখখানাকে যথাসম্ভব করুণ করে উত্তর দিলে, “শোনেন্ নি বুঝি ? বাছা আমার তিন দিন হ’ল মারা গেছে।”—এই কথা ক’টি উচ্চারণ করে মেয়েটি যেন শোকাবেগে ভেঙ্গে পড়ল।

এতক্ষণে সব ক’টা চোখই আগন্তুকদের পানে নিবদ্ধ হয়েছে। এক ধরনের ঈর্ষা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে শ্রমুতিরীতা তাঁদের তাকিয়ে দেখছে। তাদের বস্তুব্যাটা যেন এই : সত্তা তাজা রোদ ও টাইকা বাতাস খাওয়া ছ’টি প্রাণী সখ করে আমাদের দেখতে এসেছেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা তাঁদের পরিচিত প্রতিবেশে ফিরে যাবেন, আর যতক্ষণ খুসী সেখানকার আনন্দ-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে মজা লুটবেন। আমাদের কথা তখন আর মনেও থাকবে না।

অপর একটি বিছানার সামনে প্রফেসর দাঁড়িয়ে পড়তেই মহিলাটির মনে হ’ল এই মেয়েটিই সম্ভবতঃ সেই মেয়েটি। কিন্তু কাছে যেতেই হতাশভাবে লক্ষ্য করলেন, সেটি একজন মাঝ-বয়েসী বৃদ্ধা।

প্রফেসর অনেকটা পেশাদারী গলায় বললেন, “এই কেস্টি বেশ একটু অস্বাভাবিক রকমের ; কেননা, এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ইনি প্রথম মা হতে চলেছেন।”

মেয়েটিকে ঘুমন্ত দেখে অভ্যাগতা সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন, “ইনি নিশ্চয়ই নন, কারণ এঁকে দেখে ত বিবাহিতা বলেই মনে হচ্ছে।”

প্রফেসর মাথা হুলিয়ে হুলিয়ে একপ্রকার অর্থসূচক হাসি

হেসে জবাব দিলেন, “ইনি অবশ্য নন—তবে এঁরও বিবাহ হয়নি।” বলেই লক্ষ্য করলেন, এই কথা শোনা মাত্র মহিলাটি কেমন যেন মুসড়ে পড়েছেন। মাঝ-বয়েসী একজন অবিবাহিতা মহিলার জারজ সন্তানের মা হওয়াটা তিনি যেন কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। শুনে তিনি খুব অপ্রস্তুত হয়েছেন বলেই বোধ হ’ল। প্রফেসর তাঁর হাত ধরে অপরদিকের সারির মাঝামাঝি একটা খাটের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, “আরও একটা মজার ব্যাপার দেখবেন আসুন।”

একজন ফ্যাকাশে ও কুচ্ছিং মেয়ে কোলের শিশুটিকে সাপটে ধবে অবিশ্রান্ত, অসংলগ্নভাবে হেসেই চলেছিল। অধ্যাপক তাকে দেখিয়ে বললেন, “এই যে মেয়েটি দেখছেন, এর যে শুধু মাথাই খারাপ তাই নয়, ও জন্মাবধি পঙ্গু। অথচ মজা দেখুন, সেও আজ নিলজ্জভাবে সন্তানের জননী হয়ে বসে আছে। আমাদের এই খুঁষ্টজগতে কত কি যে মজার ব্যাপারই না নিত্য ঘটছে—তার আর ইয়ত্তা নেই। আপনাদের মত ঘরে বসে মোজা-বোনা সম্ভ্রান্ত মহিলার দল তা’ কল্পনাও করতে পারেন না।”

মহিলাটিকে দেখে মনে হ’ল, এবার বুঝি তিনি মুছাঁ যাবেন। স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি ফিস্ ফিস্ করে বললেন, “ও মেয়েটি নয় ত?”—মহিলাটির সর্ব চিন্তা তখন সেই একই আধারে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

প্রফেসর কিছুটা আত্মতৃষ্টির হাসি হেসে বললেন, “আহুন, আপনাকে এবার একটা স্বর্গীয় ছবি দেখাই।”

মহিলাটির দৃঢ়বিশ্বাস হ’ল এবার সেই মেয়েটির কাছেই অধ্যাপক তাঁদের নিয়ে চলেছেন। আশা-আনন্দের দোলায় তাঁর বুক ছুঁছুঁ করতে লাগল। নিঃশ্বাসও সঙ্গে সঙ্গে ভারী হয়ে এল।

জ্ঞানালার ধাবেব একটি বিছানার কাছে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন। যদিও জ্ঞানালার খডখড়ি বন্ধ ছিল তবুও সেই বন্ধ সারিসর ভেতর দিয়ে একফালি রোদ এসে বিছানার বালিশ-রাখা জায়গাটিকে রাঙিয়ে তুলেছিল। বালিসে মাথা রেখে একটি সুস্থ-সবল যুবতী ঘুমিয়ে ছিল। তার এলো ঘন চুলের রাশি বালিসের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত শিশুটির দিকে আনত হয়ে মেয়েটি ঘুমুচ্ছিলো। মেয়েটিকে দেখে মনে হ’ল, শিশুটিকে পরিচর্যা করতে করতে কখন যেন অজান্তে সে ঘুমের কোলে চলে পড়েছে। তার নৈশ পোষাকের কয়েকটি খোলা বোতামের ফাঁক দিয়ে তার স্তূঢ়-স্তূত্র কাঁধের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল দুগ্ধভারে ঝেঁষে অবনত একটি স্তনপুষ্টি স্তনাগ্রভাগ। মেয়েটিকে দেখে মনে হ’ল তার বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশী নয় এবং সে বেশ সুশ্রীই, যদিও সে অবস্থায় তাকে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ও রোগাটে দেখাচ্ছিলো।

আগন্তুক মহিলার দৃষ্টি কিন্তু তার কোলের শিশুটির প্রতিই

নিবন্ধ হ'ল। প্রথম থেকেই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলেটিকে দেখতে শুরু করে দিলেন। এমন তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন যেন ছেলেটি তাঁরই হয়ে গেছে।

পাতলা একমাথা কালো কস্কসে চুলে ছেলেটিকে ভারী সুন্দর ও সবল দেখাচ্ছিল। ছেলেটির একটি সুপুষ্ট হাত তাব মায়ের বুকের ওপব প্রসারিত। থেকে থেকে তার রাঙা ঠোঁট দুটি ফুলে ফুলে উঠছে। স্বপ্নঘোরে সে যেন জননীর স্তন্যপান করছে। গালদুটি একটু ফোলাফোলা ছেলেটি যেন একটি ক্ষুদ্র দেবদূত বা একগুচ্ছ তাজা যুঁই ফুল—যা' দেখলেই আদর ক'রে, গালের কাছে তুলে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করে। আগন্তুক মহিলাটির গোটা মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—তা' হলে এই শিশুটির কথাই অধ্যাপক বলছিলেন ? শিশুটির পবণে নানা স্থানে তালি দেওয়া সাধারণ একটি পোষাক। অতি পরিচিত হামপাতালের পোষাক ওগুলি—যা' যথেষ্ট পরিষ্কারও নয়। মহিলাটির ইচ্ছে করতে লাগল, এখনি ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে, ধুয়ে-মুছে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পড়িয়ে দেন। কতো দীর্ঘ দিন ধরেই না এমনি একটি দেবশিশুকে কল্পনা ক'রে তিনি নিজের হাতে অজস্র জামা-কাপড় বানিয়ে রেখেছেন।

এতক্ষণে তিনি প্রসূতিটির দিকে নজর দেবার সময় পেলেন। জননী শিশুটিকে আঁকড়ে ধরে নির্ভয়ে ঘুমুচ্ছে। অপর একটি

স্ত্রীলোক যে তার ছেলেটিকে কেড়ে নিতে নিঃসারে তার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন, সে বিষয়ে সে পরম নির্বিকার। কয়েক মুহূর্তের জন্য আগন্তুক মহিলাটির হৃদয় এক অপূর্ব স্নেহরসে সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই পৃথিবীতে এই মা ও শিশুটিকে—আলাদা করে রাখা সত্যিই এক নিগূঢ় লজ্জা ও অপমানের কথা।

কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বার্থের ওজরে তাঁর সব দুর্বলতা ভেসে গেল। তিনি ভাবলেন, এই মাকে একদিন না একদিন সম্ভানকে পরিত্যাগ করতেই হবে, কেননা, ওর জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক অকথিত লজ্জা ও ঘৃণার ইতিহাস। দুঃখের প্রথম প্রদাহ কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি এ ব্যাপারে খুসী হয়ে উঠতে বাধ্য। নিজের অভিশপ্ত সম্ভান যে একজন মনের মত নতুন মা পাবে, এটা তার পক্ষে কম খুসীর কথা নয়!

হঠাৎ নিদ্রাভিভূতা যুবতীটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছাঁজন মহিলা পরস্পরের প্রতি কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আগন্তুক মহিলাটি সেখান থেকে সরে গিয়ে অশ্রু দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

এ দৃশ্যে শ্রুতিসর ও কিছুক্ষণের জন্তে বেশ অশ্রুস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করে তিনি হাসিমুখে প্রশ্নটি করে জিজ্ঞাসা করলেন, “রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত? বাচ্চাটি ভাল আছে ত?”

মেয়েটি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে গলা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। শিশুটি ততক্ষণে জেগে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে শুরু করে দিয়েছে। জননী বুঁকে পড়ে তাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এক সুগভীর লজ্জার অরুণাভা তার গণ্ডে তখন যেন আবার ছড়িয়ে দিয়েছে।

আগন্তুক মহিলাটি ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে যেতে আর একবার আড়চোখে শিশুটিকে দেখে নিলেন। তাঁর মনে হ'ল, তিনি বুঝি আপন সম্ভানের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে নিকদ্দেশ যাত্রায় চলেছেন।

দুই

পৃথিবীতে বহু ধরনের ক্লাস্তি আছে !

সুখী লোকে ক্লাস্তি হয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার এমনও ক্লাস্তি আছে, যা থেকে ঘুমিয়েও নিস্তার নেই। দুঃস্বপ্নের মতই সেই ক্লাস্তি সর্বদা ঘুমের ঘোব কাটিয়ে দিতে চায়। জানালার পাশের ৪৭ নম্বরের আজ সেই দশা। ঘুমিয়ে পড়ল সে অত্যন্ত ক্লাস্তি হয়ে, কিন্তু কিছুক্ষণেব মধ্যেই জেগে উঠে সে পুনরায় সুগভীর ক্লাস্তিতে তলিয়ে গেল।

অতবড় একটা ঘবে অতগুলি কচি শিশুর চ্যা-ভ্যাঁব মধ্যে ঘুম আসা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। যদি বা তাব নিজের সমস্তানটি চুপ করে শুয়ে আছে অপব একটি শিশু হয়ত হঠাৎ কেঁদে উঠল। কখনও দখনও আবার একাধিক শিশু জেগে উঠে কান্নার ঐকতান স্রব করে দিলে। এক যতই সে নিদ্রান্নতাব জন্মে বিবস্ত্র হতে লাগল, ততই তাব শব্দ-সহনশীলতাব ক্ষমতা কমে এল। ক্রমশঃ তাব মেজাজ গেল বিস্ত্রী বকম বিগড়ে।

এই সাত দিন সে এখানে এসেছে। এর মধ্যে একসঙ্গে আধ ঘণ্টার বেশী সে কখনও ঘুমুতে পারেনি। মাথায় যেন তার নেমে এসেছে পর্বতের ভার। আলোর সামান্যতম রেখাও তখন অসহ্য বোধ হচ্ছে। পিঠের নীচে শক্ত তোষক কাঁটার মত পিঠে বিঁধছে। পিঠ ও শিরদাঁড়া ব্যথায় টনটন করে উঠছে।

সর্বদা বুকের মধ্যে থেকে এক উদগত অশ্রুর নণ্মা ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে। আত্মদমনের সব শক্তিই যেন সে অকস্মাৎ হারিয়ে বসে আছে।

কলুই-এর ওপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে সে উঠে বসল। বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পাশের বাড়ীর ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখল, বাইরে রোদের তেজ কমে এসেছে। গো-ধুলির ধূসর আকাশের দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। দূর-বনানীর ওপারে পাহাড়ের শীষদেশগুলি অন্তগামী সূর্যের আভায়ে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। এই একই জানালা দিয়ে বোজ বোজ একই দৃশ্য দেখে দেখে তার কেমন যেন ক্লান্তি এসেছে। কিন্তু তবুও তার নিকট-প্রতিবেশের তুলনায় দূরের ঐ একঘেঁয়ে দৃশ্য অনেক ভাল।...সহরের ভেতরে একটা গীর্জার গম্বুজ তৈরী হচ্ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মনে হতে লাগল, কেউ যদি ওখান থেকে অসাবধানে পড়ে যায়? মাথাটা তার হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে উঠল।...

এখন সকলেরই দৃষ্টি ঘন ঘন দরজার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। তাদের সাক্ষ্য-আহারের সময় হয়েছে। সকলের মুখেই প্রত্যাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। আশা করতে কি দোষ যে আজকে তাদের ভাগ্যে কালকের চেয়েও ভাল খাওয়া জুটলেও জুটতে পারে?... এমন সময় একজন খাত্রী তার বাহুমূল স্পর্শ করতেই ৪৭ নম্বর চমকে উঠল। খাত্রীটি তার হাতে ছোট একটা টাকার থলে

ওঁজে দিয়ে নীচুস্বরে বললে, “দশ ক্রোণারের বেশী মোটে পাওয়া গেল না।”

যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, এমনি দৃষ্টিতে ৪৭ নম্বর মেয়েটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বললে, “বলকি ? ঘড়িটা যে সোনার !”

“ওরা বলে ওটা নাকি বেজায় পুরণো আর প্রায় অকেজো।”

৪৭ নম্বর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে থলেটা বিছানার একপাশে রেখে দিয়ে খাত্তীটিকে ধন্যবাদ জানালে।

খাত্তীটি চলে যেতেই সে আবার গভীর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। খানিকক্ষণ পরে বিছানার তলায় হাত দিয়ে সে আর একটি ছোট টাকার থলে বাব করলে। দেখলে সেখানে রয়েছে মাত্র আট ক্রোণার। তা’হলে দশ আর আট—এই আঠাবো ক্রোণার মাত্র তার পুঁজি। এদিকে হাসপাতালের দেনা কোন্ না পঁচিশ ক্রোণারে দাঁড়াবে ?

৪৭ নম্বর পুনরায় ভাবনার অগাধ সমুদ্রে ডুবে গেল। এমনি একটানা ভাবনা সে ভাবছে অহোরাত্র—আজ কয়েক দিন ধরে। সত্যিই কি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত বাকী দেনার জন্তে তার নাম-খামের জন্ত জুলুম করবে ? যাক্ ওভারকোটটা বেচলে কোন্ না দশ ক্রোণার পকেটে আসবে। কোটটা প্রায় নতুনই আছে। এদিকে বসন্তকালও ত এসে গেল ! যদি কোনরকমে এখানকার দেনা মিটিয়ে একবার সে বেরিয়ে পড়তে পারে তা’হলে এর পরে ভাববার সে প্রচুর সময় পাবে।

এই ভেবে সে অনেকটা হুঁশু হ'ল। আব একবার সে চোখেব পাতা বুজবাব চেষ্টা করলে। নাঃ, ভেবে ভেবে সত্যিই আব পাবা যায় না! এই তেঁতো আব নিবস ভাবনার কি আব শেষ হবে না? দূব হোকগে ছাই, ভেবে আব সে অনর্থক মাথা খাবাপ কববে না। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তীব হাতে সে নিজেকে ছেড়ে দেবে।

হুঁজন ছাত্রী-খাত্রী দরজা ঠেলে ঘবে প্রবেশ করল। তাদের হুঁজনের হাতেই খাবাবেব ট্রে। সেই মামুলি পরিজ্ আব নীলচে দুধ—যা' চোখে পড়ামাত্র সবকটি কগীই বিবক্ত্ হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। প্রসূতিদেব খেতে দেওয়া হ'ল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছবল যে তাদের চাম্চে দিয়ে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। কেউ কেউ আবার ফিদের জ্বালায় তাড়াতাড়ি ঐ অখাছগুলো গিলতে লাগল।

৪৭ নম্বব ভেবেই চলেছে। এক বৎসব আগে পর্যন্ত সে কি কল্পনা কবতেও পেবেছিল যে একদিন তাকে নর্দমা থেকে তুলে আনা ঐ সব খাণ্ডবগুলোব সাথে এক সঙ্গে, একছাতেব নীচে বাস করতে হবে?

পডন্ত বোদের কিছুটা সোনালী আভা জানালা বেয়ে টেব্চা হয়ে ঘবের এক অংশে পড়েছে। ঘবের বাকী অংশটুকু ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছে। বিছানায় শায়িত মূর্তিগুলিকে এখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

কোণের দিকে একটি বছর আঠারোর মেয়ে অনবরত ‘খাব’ ‘খাব’ করে চীৎকার করছিল। সে ক্রমাগতই বলে চলেছে, “এক ক্রোণারের বিনিময়ে কেউ কি আমাকে তার খাবারের অংশ বেচবে না?”—তার সোনালি রঙের কাঁপানো চুলের ওপব পড়ন্ত রোদের লালিম। পড়ায় তাকে অপক্লপ সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

ছাত্রী-শাত্রী একজন প্রস্তুতিকে খাওয়াবার জন্তু খুব খোসামুদি করছিল। স্ত্রীলোকটি অঝোর-নয়নে কেঁদেই চলেছে। কিছই খাবে না সে। * ওটি একটি নিরাশ্রয়া ভিখারিণী। গতকাল তার সন্তানটি খারাপ রোগে মারা গেছে। তবুও সে তার মৃতপুত্রের জন্তে, আহার-জল ত্যাগ করে কেঁদেই খুন হচ্ছে, কোন প্রবোধই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না।

অপরদিকের কোণের দিক থেকে সেই মেয়েটি আবার চীৎকার করে উঠল, “আমাকে আর একটু পরিজ্ দাও না! কি দরকার ওটাকে সেধে— দাওনা ওর খাবারটা, আমি খেয়ে ফেলি। ক্ষিদেয় যে আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।”

প্লেটের ও চামচের ঠুনঠুনিতে স্থানটি মুহূর্তেই সরগরম হয়ে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই খাবারের নিন্দেতে যেন পঞ্চমুখ। একজন কৃষক-কণ্ঠা চাম্চে দিয়ে দুধ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিক্রোহের বাষ্পে ফেটে পড়ল যেন!—“রাম কহ, এর নাম কি দুধ?” চামচে দিয়ে কয়েক কাঁটা দুধ সে মেঝেতে ছিটিয়ে দিলে।

নার্স কোমরে হাত দিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল, “বলি তোমাদের

ব্যবহারটা কি শুনি? ওরকম অসভ্যতা করলে প্রফেসরকে রিপোর্ট করে দেব—তখন বুঝবে মজাটি!”

“যাও, যাও, ভারী আমার প্রফেসর-রে? নিয়ে এস না তাকে এখানে। সেই বিট্লে মিন্‌মেকেই জিজ্ঞাসা করব, এখানকার গরুগুলো কি ছুধের বদলে জল দেয়?”

একজন মুখরা স্ত্রীলোক এতক্ষণে কথার তুবড়ি ছুটিয়ে বললে, “আহাঃ, কি ভাল ব্যবহারই না পাচ্ছি এখানে? আমরা ত পথের আবর্জনা! আর আমাদের সম্মানরা যদি মরেই যায়, তা’হলেই বা কার কি এলো-গেল? কিন্তু ওদিককার সৌখীন ওয়ার্ডে দেখে এস গিয়ে, মেমসাহেবরা সব সিঙ্কের চট্‌কদার পোষাক পড়ে শুয়ে আছেন। আমাদের ছুধের ননী আর মাখন দিয়ে তাদের পেটের গর্ত বোজানো হচ্ছে। আমরা কচি খুকী আর কি! কিছু বুঝিনা, না? এ পৃথিবীতে বড়লোকের পা চাটুতেই ত গরীবের জন্ম।

চারিদিক থেকে সমর্থনসূচক ধ্বনি উঠল। বাড়তি একটুখানি পরিজ্ঞের জন্ম যে মেয়েটি এতক্ষণ মাথা খুঁড়ছিল, এইবারে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, “খাবার কথা আর বল কেন? ঐ অনামুখে প্রফেসরটিই কি কম! এদিকে আমাদের সঙ্গে কুকুরের অশ্রম ব্যবহার করেন, আর ওদিকে দেখ গিয়ে, বড়লোকদের বিবি দেখলেই হাঁটু গেড়ে বসে, হাতে চুমু খাবার সে কি ধুম! ওদের সব ভাল-ভাল খাবার খাওয়ান হচ্ছে। আমাদেরই বেলায় যত বিট্লেমি।”

অপর একটি মেয়ে রসিয়ে বললে, “যেন বড়লোকের বিবিদের ছেলে-পিলে ভিন্ন পথে হয়!”

এই কথাই হাসির একটা রোল উঠল। সেই ঐকতান হাসির কলরোল ছাপিয়ে বিকৃত-মস্তিষ্কা, ছন্নছাড়া মেয়েটির চাপা কান্না থেকে থেকে ঘরের মধ্যে পাক্ খেতে লাগল।

এইবার শিশুদের ঢালাও নৈশ-শয্যার পালা। ছ’জন ধাত্রী কোনরকমে তাদের ধোয়া-মোছা সেরে পোষাক বদলে দেবার তোড়জোড় করছে। অপর একজন ধাত্রী একগোছা অপরিষ্কার ও ভেজা জামা নিয়ে এসে হাজির। ঠোঁড়ের আগুনে সেগুলোকে একটু নিম-শুকোন গোছের করে নিয়ে ছেলেদের পোষাক বদলাতে বসে গেল। পোষাকের ছিরি-ছাঁদ দেখে মায়েরা ত খড়্গ-হস্ত। ধাত্রী ছ’জন অদৃশ্য কোন একজন ধাত্রীব ঘাড়ে সবটুকু দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, “মরি, মরি, কাজেব কি ছিরি গো! ওসব সত্বরে বিবিদের মোমের হাত। জলে আঙুল চোবান না, পাছে সোনার অঙ্গে কালির ছাপ লাগে।”

এই মোক্ষম ব্যাখ্যায় শ্রুতিদের মন ভিজলো না। তারা একযোগে গালাগালি, রাগারাগি ও নানা দৈহিক আক্ষেপ-বিক্ষেপ সহযোগে গায়ের ঝাল মেটাতে লাগল। ৪৭ নম্বরের এসব গোলযোগ একেবারেই ভাল লাগছে না। সে অগত্যা কানে হাত দিয়ে, কাত্ হয়ে শুয়ে রইল। না, এখানকার এই কচকচি সত্যিই অসহনীয়।

অবশেষে গালাগালির দম্কা বাতাস একসময় আপনা হতেই থেমে এল। খর রসনা শাস্ত হ'ল। যদি মেনে নেওয়া যায় যে শিশুদের প্রাথমিক চরিত্র-গঠন মাতৃসুত্তেই সঞ্চারিত হয়, তা'হলে এ কথা ঠিক সত্য যে এখানকার নবজাতকেরা সব অবশ্যই উত্তরকালে স্বনামধন্য 'অ্যানাকিষ্ট' হয়ে দাঁড়াবে।

৪৭ নম্বরের শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। শিশুটির গায়ে একখানা আলতো হাত রেখে সে বাইরের ধূসর সান্ধ্য-আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে ছিল। এতক্ষণে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছে, ঘরের ছাদ পর্যন্ত ক্রমশঃ অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে আসছে। এইবার এই সান্ধ্য অন্ধকারে প্রসূতিদের গল্পের আসর বসবে—কতো রকমের অদ্ভুত আজগুবি সব গল্প! সবই প্রত্যক্ষদর্শিনীর আপন অভিজ্ঞতার কথা, এবং সবই এই হাসপাতালের স্বাসরোধকারী আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে। মারাত্মক রকমের রোমহর্ষক আখ্যায়িকাগুলি এইবার ক্রমাগতই আখ্যাত হতে থাকবে। ৪৭ নম্বরের এসব আর ভাল লাগে না। কাঁহাতক আর রোজ রোজ একই খোঁয়ারী ভাল লাগে!

সে বিরক্ত হয়ে, ঘুমের ভাণ করে, মট্কা মেরে পড়ে রইল।

তিন

নাঃ, ঘুম আর আসে না ! রাজ্যের চিন্তা উত্তপ্ত মস্তিষ্কে এসে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে । ৪৭ নম্বর বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল । এখন প্রায় মধ্যরাত্রি । অগ্ন্যাশু বিছানা থেকে দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে । কারুর কারুর তা রীতিমত নাকই ডাকছে । কখনও কখনও কোন একটি শিশু জেগে উঠে ভীষণ কান্না জুড়ে দিচ্ছে । বাইরের পৃথিবী যেন অদ্বুত স্তব্ধ ।

যখন অতিরিক্ত ক্লান্তিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় তখন চিন্তার শক্তি যেন অপরাজ্য হয়ে ওঠে । রাতের পর রাত একই চিন্তার ভীষণতা মানুষের টুটি চেপে ধবে । অন্ধকারে রাজ্যের বিভীষিকা ভীতিময় রূপ ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ।

এখন অবশ্য আবর্জনা স্তূপে শুয়ে আছে সে, কিন্তু চিরদিনই তার এরকম দিন ছিল না । সেও একদিন কোন এক রৌদ্রোজ্জ্বল সোনালী ভূখণ্ডে পরিভ্রমণ করে বেড়াত । তার এখনকার পৃথিবী কল্পনাতীত ভাবে পৃথক ।...এখনও যেন সে সেই স্বর্গোদ্ভানটিকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে । কত শত পরিচিত মুখ তার সামনে দিয়ে ছায়াছবির মত ভেসে যাচ্ছে । তাদের সকলকেই সে অপরিসীম ঘৃণা করে ।...৪৭ নম্বর পাশের প্রসূতির ঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখলে, ছুটো বেজেছে । দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে, ওঃ, আজকের এই কালরাত্রি কি আর পোহাবে না ?

আবার সে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শত চেষ্টাতেও ছ'চোখের পাতা এক করতে পারলে না।... সে চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে মাঝ-সমুদ্রে একটি আনন্দোজ্জ্বল দ্বীপখণ্ডকে। তার মধ্যে একটি ছোট্ট কুটীর। সমুদ্রের আলো-ঘরের রক্ষকের বাসস্থান সেটা। এখনও তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা সেই কুটীরে বাস করছেন। তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানেন না তার এই বিপদের কথা।—সে পাশ ফিরে শুয়ে অক্ষুট আর্তনাদ করে উঠল।...আবার ছায়া ছবি ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়। চৌদ্দ বছরের একটি বালিকা সেই সুন্দর দ্বীপে ধীর কন্ঠাদের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রগর্জন যেন সে এখান থেকেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কখনও কখনও সেই ক্ষুদ্র বালিকাটি চলেছে তার মা'র সঙ্গে খানা-ডোবা পার হয়ে, পাহাড়-বেষ্টিত সর্পিলা পথটি ধরে, ছোট্ট গীর্জার দিকে।

—সে আর তার ছ' ভাই বাবার কাছে পড়া বুঝিয়ে নিচ্ছে। বাবা ও মা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী মানুষ। মা কড়া ধর্মপরায়ণা মহিলা, আর বাবা পাঁড় মাতাল। কতৃপক্ষের অবিচারে বাবার চাকরী গিয়েছিল, তাই বৃদ্ধ বয়সের শোক ভুলতে তিনি মদ ধরেছিলেন। অহোরাত্র নির্জলা মদে চুর্ হয়ে থাকতেন।

তার ছোট ভাই ছ'টি কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে গেল। বড়টির জালিয়াতীর অপরাধে হ'ল জেল, আর ছোটটি একজন সার্কাসওয়ালীর প্রেমে পড়ে দেশান্তরী হ'ল। মা এইসব ছবিপাককে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ভেবে চুপ করে সয়ে গেলেন। আর

তুর্ভাবনায় ও মনোকষ্টে বাবার সব ক'গাছি চুলই গেল পেকে। কিন্তু সে সঙ্কল্প করলে যে করে হোক বাপ-মায়ের মুখে সে পুনরায় হাসি ফিরিয়ে আনবে। সেইভাবে সে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল।

যখন তার বয়স ষাইশের ওপর হয়ে গেছে, তখনও সে তার আরক্ণ কর্ম করে চলেছে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে, নিবাসন্ত ভাবে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে। তাদের এই বিবশ জীবনে কোন আত্মীয়ই তাদের দন্ধ-ভাগ্যেব সঙ্গদান করতে এগিয়ে এলেন না। এই স্বাসরোধকারী একাকীত্বেব মধ্যে তাব দিনগুলি মন্থবগতিতে গড়িয়ে চলল।

এমন সময় তার দূর সম্পর্কের এক কাকীমাব কাছ থেকে এল একখানা চিঠি। কাকীমার অবস্থা ভালই। মোজেন্ অঞ্চলে অগাধ সম্পত্তি ও জমিদারীর মালিক। তিনি তাকে কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাবা শুনে ঠোটে পাইপ চেপে বললেন, “তাহলে ওরা এখনও আমাদের ভোলেনি দেখছি।”

কয়েকদিনের জন্তে এই খাঁচার জীবন থেকে সাময়িক মুক্তি— মন্দ কি! অনেক ভেবেচিন্তে বাবা মত দিলেন। মাত্র গত বসন্তের কথা এ সব! অথচ কতদিনের কথা বলেই না মনে হয়। উত্তেজনায় ৪৭ নম্বর বিছানায় উঠে বসল। ছ'হাতে মুখ ঢেকে অফুটস্বরে কঁমে উঠল, ‘ভগবান! ঘুম কি আজ আর আসবে না?’

আবার তার অধ-নিমীলিত নেত্রে ভেসে উঠল এক

জমিদারের বাড়ীর ছবি। লেকের ধারে গাছ-পালা বেষ্টিত মস্ত একটা বাড়ী। লেকের শাস্ত্র জলে অট্টালিকার ছায়া পড়েছে। জুন মাসে বাগানের আপেল গাছগুলিতে থরে থরে মুকুল ধরেছে। মাঠের সবুজ ঘাসগুলি নিদাঘের শাস্ত্র বাতাসে শিরশির করে কাঁপছে। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তার ছোটঘরের বারান্দাটিতে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস সারা অঙ্গে শাস্ত্র প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। লেকের মাথায় উঠেছে একাদশীর একখণ্ড চাঁদ।

কি এক অজ্ঞাত কারণে প্রথমাবধিই কাকীমাকে বা খুড়তুতো বোনদের তার ভাল লাগেনি। তাব বাপ ভাইদের নিয়ে তাঁরা অযথা কৌতুক করতেন। ঐ তার একটি দুর্বল স্থান যেখানে আঘাত কবলে সে সহিতে পারে না। সে বুঝতে পারল তাঁরা সবাই তাকে করুণা করছেন। দৃষ্টি দিয়ে, ইঙ্গিত করে এবং বাক্যযন্ত্রণার সাহায্যে তাঁরা সর্বদা তার দুর্বল স্থানে আঘাত করতে চেষ্টা করছেন। এমনকি তার পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়েও ব্যঙ্গ করতে তাঁরা কল্প করতেন না।

এ সব অপমান তাকে নীরবে সহিতে হ'ত, কারণ এত শীঘ্র বাড়ী ফিরে যেতে তার মন চাইছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ তার রাগ হ'তে লাগল। বিন্দু বিন্দু ক'রে মনে ঘৃণা জন্মতে লাগল। কিন্তু তা' সে প্রকাশ করল না। এইভাবে বাধ্য হয়ে সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে শিখলে। বানিয়ে বানিয়ে সে বাড়ীতে খুশী-ভরা চিঠি লিখে পাঠাতে লাগল।

কাকীমার বহু আত্মীয়-স্বজন তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে হু' একজন তার প্রতি একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠতা দেখাতে লাগলেন। একজন ধনী চাষী ত তাকে বিবাহ-প্রস্তাবই ক'রে বসলেন। তাবপরে একদিন একজন পশুচিকিৎসকও পূর্বোক্ত মহাজনের পথে পা বাড়ালেন। বলা-বাহুল্য সে ঘৃণাব সঙ্গেই এঁদের উভয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। সে তখন রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে শুরু কবেছে—শুধু তার বাপ মাকে খুসী করবার জন্তই নয়, সে চায় তার বোনেদের ওপর টেকা দিতে, তাদের ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে।

অবশেষে এল সে,—তার কাকীমার মৃতস্বামীর কি সূত্রে যেন আত্মীয় হয়। সবে মাত্র ডাক্তারী পাশ করেছে এবং অবস্থাও অত্যাশ্চর্য্যগুণঃ নয়। সে লক্ষ্য কবছে যুবকটি তার একজন বোনের প্রতি, যেন একটু বেশী মাত্রায় আগ্রহ দেখাচ্ছে। অতএব সেও তাকে তাকে রইল কি করে বাতাসটা নিজের পালে টেনে আনা যায়।

যুবকটি নিজে যেন একটি সজীব প্রাণ-চঞ্চলতা—বাড়ীটাতে সে প্রাণপ্রাচুর্য্য ফিরিয়ে আনলে। আজ পর্বত-আরোহণ, কাল জঙ্গলে চড়ুইভাতি। হাসি, আনন্দ ও উচ্ছলতা যেন লেগেই রইল। সেই আনন্দ-প্রবাহে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। আর তার বোনেদের হিংসা করবার প্রয়োজন নেই। এখন আর প্রতিহিংসা নয়, এখন শুধু আনন্দ আর বিজয়োৎসব।

বনে বনে চলল তাদের গোপন অভিসারের পালা।

সপ্তাহগুলি যেন আনন্দের হিলোলে ছুটে পালাতে লাগল। সে কল্পনা করতে শুরু করলে, তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা যেন কন্ঠার আনন্দ-স্নেহচ্ছায়ায় এসে পরিণত বয়সের শ্রান্তি অপনোদন করছেন।

তারপর হঠাৎ একদিন সে চলে গেল। বিদায় মুহূর্তে তাকে কোন কথা জানাবার অবসর হ'ল না। মন তার অস্থিস্থিতে ভরে উঠল। প্রত্যহ সে আশা করতে লাগল, এইবার বুঝি তার নামে একখানা পত্র আসছে। কিন্তু কোন পত্রই এল না। তখন বাধ্য হয়ে নিজেই সে একখানা পত্র লিখলে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু সে পত্রের জবাব এল না।

তারপর একদিন অত্যন্তভাবে সে এক নির্ভুর মতের মুখোমুখী দাঁড়াতে বাধ্য হ'ল। খাবার টেবিলে এ-কথায় সে-কথায় গুনলো, যুবকটির ক্রিস্টিয়ানা সহরের একটি মেয়ের সঙ্গে বাকদান হয়ে গেছে—শীঘ্রই বিয়ে হবে। ওঃ সেদিনের সেই নির্মম মুহূর্তগুলির কথা সে কোনদিনই ভুলবে না।

সেই দুর্মুখ রাত্রির কথা তার মানসপটে ভেসে উঠল। মাঠে মাঠে সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেমন্তের ছোট দিনের বেলা ফুরিয়ে এল। ধরণীর বৃকে আন্তে আন্তে নেমে এল ধূসর সন্ধ্যা। ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে সে ছুটে চলেছে উদ্ভ্রান্তের মত। এমন সময় তার মনে সেই ভীষণ চিন্তা উদিত হ'ল। যদি সত্যিই তাই হয়? যদি সত্যিই সে হুর্ভাগ্য নেমে আসে তার জীবনে?...

আস্তু আস্তু ভোরের আলো জেগে উঠল পৃথিবীর বুকে। সে তখন ঘরে ফিরে এল। সারাটা দিন সে অস্বাভাবিকভাবে কাটিয়ে দিল। পূর্বের মত হাসল, গান গাইল। পাছে অপরে তার অবস্থার কথা জানতে পাবে এই ভয়ে সে খুসীর ভাণ করে হেসে-খেলে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে সে টের পেল যে তার সর্বনাশ হয়েছে, সে সন্তানের মা হতে চলেছে। যখন তার কঁদে বুক ভাসিয়ে দেবার কথা তখন অবস্থাবিপাকে তাকে হেসে উঠতে হ'ল। না, কোনমতেই ব্যাপারটিকে সে লোক জানা-জানি হতে দেবে না। এ বিপদ থেকে যেমন করেই হোক তাকে উদ্ধার পেতেই হবে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে? বাড়ীতে? না, তার বৃদ্ধ বাপ-মায়ের ভাঙ্গা কাঁধে এ কলঙ্কের বোঝা আর সে চাপাতে পারবে না। তাঁদের প্রায় অবনমিত মাথাকে সে আবও হুইয়ে দিতে পারবে না মাটির ধুলোতে!

একদিন বাড়ীতে সে এক উচ্ছ্বাস-ভরা চিঠি লিখে জানালে যে সে স্কুলে ভর্তি হতে চায়, বাবা যেন কিছু টাকা অবিলম্বে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিনের মধ্যেই টাকা এসে পৌঁছল। তারপর একদিন সে খামকা কাকীমার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে তাঁর বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

আহত পশুর মত গর্জাতে গর্জাতে সে সহরের বুকে আশ্র-গোপন করলে। একমাসের জন্তে একটা ইস্কুলেও ভর্তি হ'ল। কিন্তু অধিকদিন স্কুলে যেতে আর তার সাহস হ'ল না। সে

ঘরের কোণায় নিজেকে বন্দী করে রাখল। ওঃ, সে শীতকাল যেন আর কাটতে চায় না !

তারপর একদিন সন্ধ্যায় কোনগতিকে সে প্রস্তুতিসদনে এসে উপস্থিত হ'ল। এক অব্যক্ত বেদনায় তার সারা অঙ্গ তখন আকুঞ্চিত হচ্ছে। ডাক্তার খাতায় লেখার জেগে তার নাম ধাম জানতে চাইলেন, কিন্তু একগুঁয়ের মত সে চুপ করেই রইল।

কিছুক্ষণ পরে তাকে জোর করে নাওয়ান-ধোওয়ান হ'ল এবং একটা ময়লা ও দুর্গন্ধময় বিছানায় ধরে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। ইতিপূর্বে সে কল্পনাও করতে পারেনি যে মানুষের জীবন এত নির্জন ও নিরানন্দ হ'তে পারে।

আরও দুর্ভোগ তার কপালে লেখা ছিল। রাজ্যের ডাক্তার ও ছাত্র জড়ো হয়ে তাকে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলে। প্রথমে তার মনে হ'ল সে বুঝি লজ্জায় মরেই যাবে। সে প্রতিবাদ কবতে ছাত্রেরা শ্লেষভরে বললে, তারা নাকি ওখানে শিখতেই এসেছে—মজা করতে নয়।

দীর্ঘ পনের ঘণ্টা ধবে সে কি অব্যক্ত যন্ত্রণা। 'মা' 'মা' বলে সে চীৎকার করতে লাগল। সন্ধ্যার দিকে দু'জন ছাত্র রাত্রেব ডিউটি দিতে হাজির হ'ল। জ্ঞানার্জনের জেগে তারাও তাকে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিল। তারা আরও দু'জন ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে এল। তারপর পঙ্গপালের মত জ্বী-পুরুষ একে একে এসে জড়ো হতে লাগল। সে যেন আর রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ নয়। সে যেন একটা জড়পদার্থ,

একটা কৌতূহলের সামগ্রী। সকলেই তাকে নেড়ে-ঘেঁটে তাদের শিক্ষার ভিত্তিকে পাকা করে নিতে চায়। এদিকে তার প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হচ্ছে সে দিকে কারও দৃষ্টি নেই। সে বিনা প্রতিবাদে অনড় হয়ে পড়ে রইল। উঃ! কি নির্ধূর, কি সাংঘাতিক সে অবস্থা—কল্পনা করতে আজও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

রাত্রের মধ্যে আরও দুজন প্রসূতিকে ভর্তি করা হ'ল। তাদের চীৎকারে কাণ পাতা দায়। প্রতিটি প্রসূতির মাঝখানে একটা করে পাতলা কাপড়ের পর্দার ব্যবধান মাত্র। রাত্রের দিকে সহকারী সার্জেন এলেন। তিনিও তাকে যথাবিধি পরীক্ষা কবলেন। তিনি আবার ছাত্রদের ডেকে এনে, তাকে উপলক্ষ্য করে বিশেষ ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। একটা কি যন্ত্র দেখিয়ে বললেন, “এটা প্রয়োগ করা দরকার।” যন্ত্রটি নিয়ে তিনি কাজ শুরু করে দিলেন। ছাত্ররা হাঁ করে সব কিছু দেখতে লাগল। তারপর! তারপর!!—তারপরের কথা আর কিছু মনে নেই তার।

জ্ঞান হ'লে সে সাস্কার্বে লক্ষ্য করলে যে সে তখনও জীবিত আছে। হঠাৎ হাসপাতালের অস্থান্য সব শব্দ ও প্রসূতিদের কলরব ছাপিয়ে একটি তীক্ষ্ণ শিশুকণ্ঠের কান্না তার কাণে এল। তৎক্ষণাৎ তার মনে হ'ল, পরীরা যেন তাকে স্বর্গে বহন করে নিয়ে চলেছে। এক স্বর্গীয় পুলকে তার সমস্ত অন্তরাঙ্গা ঝঙ্কত হয়ে উঠল।

যে মেয়ে ছাত্রটি তাকে পরিচয় করছিল, সে এগিয়ে এসে জানালো যে তার একটা সুন্দর খোকা হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে ছোট্ট বাচ্চাটিকে যখন ধুইয়ে মুছিয়ে তার কোলে দেওয়া হ'ল তখন আনন্দাশ্রুতে তার বুক ভেসে যাচ্ছে।

তারপর যতই দিন যেতে লাগল ততই এই নিদ্রাহীন রাত্রি, বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ ও অতীতের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে তার নবজাগ্রত মাতৃহের সুষমা নিঙরে নিতে লাগল। বিছানা হয়ে দাঁড়াল অঙ্গার শয্যা।

চিন্তার আবর্তে সে সারারাত জেগে কাটিয়ে দিলে। দিবাগমেব সঙ্কেতরূপে সহরের বৃকের ওপর যখন আন্তে আন্তে হলুদে একফালি আলো ছড়িয়ে পড়ল তখন গভীর হতাশায় ভেঙ্গে প'ড়ে সে কঁদে উঠল, “আর একটি রাতও যদি এমনি বিনিদ্র কাটাতে হয়, তাহলে নির্ধাৎ আমি পাগল হয়ে যাব।”

চার

ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রফেসর ওয়ার্ড দেখতে বেড়িয়েছেন। ৪৭ নম্বরের দিকে সহাস্রমুখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হচ্ছিল ত?”

৪৭ নম্বর মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে বললে, “খন্ডবাদ, তা’ একরকম হয়েছিল বইকি!” সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলে, প্রফেসর আজ কেমন যেন সদয় হয়ে উঠেছেন তার ওপর।

প্রফেসর তার কজি ধরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘড়ি মিলিয়ে নাড়ী পরীক্ষা কবলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, “কই, তা’ ত মনে হচ্ছে না।” মেট্রিণের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ঐ দিককার ঐ একবিছানা-ওয়ালা ফাঁকা ঘরটায় একে বদলি করে দাও।” এই বলে তিনি সম্মেহ-সুপ্রভাত জানিয়ে, অস্থান্য রুগী দেখতে বেড়িয়ে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পবে তাকে যখন সবাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে তখন ওয়ার্ডময় একটা চাকল্যের সাড়া পড়ে গেল। সে যখন বিদায় নিচ্ছে তখন বিস্ময়ে ও ঈর্ষায় অস্থান্য রুগীদের কল্জে ফেটে যাবার উপক্রম! তারা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে, ইঠাৎ মেয়েটিব প্রতি ভালবাসার এত ধূম পড়ে গেল কেন!

দক্ষিণ-খোলা একটা ঘরে তার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, খাটের ওপর ধব্ধবে বিছানা পাতা, এমনকি গায়ে দেবার লাল কস্বলগুলি পর্যন্ত যেন পরিচ্ছন্ন।

বিছানায় শুয়ে তার বেশ আরাম বোধ হ'ল। ঘরের এক কোণে বাচ্ছাটিব জন্তে একটা দোলনা রয়েছে দেখে তার মনটা খুসীতে ভরে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এল এক কাপ গরম চকোলেট। সে ভেবে উঠতে পারল না, এ সবার কি অর্থ! ভাবনা হ'ল, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে না ত!

ছপুয়ের খাবার সময় প্রফেসর আবার এলেন। প্রফেসরের প্রতি তার মন যেন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। সে হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালে। অধ্যাপক বিছানার ধারে বসে পড়ে স্নেহভরে তার হাত ছ'খানি তুলে নিয়ে বললেন, “তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। এখনি অবশ্য উত্তর চাই না, ভেবে-চিন্তে কাল জবাব দিও।” খানিকটা চুপ করে থেকে আবার তিনি বললেন, “তোমার সঠিক পরিচয় জানি না, কিন্তু বয়েস হয়েছে, অভিজ্ঞতাও কিছু কম হয়নি স্ততরাং কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারি। হয়ত তোমাব বিয়েও হয়েছে, তোমাকে দেখে বেশ ভদ্রবাবের মেয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু এও হ'তে পারে যে এখনও তুমি অবিবাহিত। তোমার বিয়ে হয়েছে, কি হয়নি, তা' জানতে চাই না। কিন্তু তোমার ছেলেটি যদি একটি ছোট-খাট রাজহু পায়, আশা করি তোমার তা'তে খুব আপত্তি হবে না। অর্থাৎ আমাব বলাব উদ্দেশ্য এই যে, ধর, তোমার ছেলেকে যদি কোন সহৃদয়, বিত্তশালী, নিঃসন্তান দম্পতী নিজের ছেলের মত মানুষ করতে চান, তোমাব কি খুব আপত্তি হবে তাতে?”

প্রফেসর একদৃষ্টে তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন।
এ কথা শুনে মেয়েটি আব নিজেকে সামলে রাখতে পারল না।
তার মুখ লাল হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, অধ্যাপক যেন তার
সঙ্গে বসিকতাই করছেন।

অধ্যাপক পুনরায় বললেন, “হয়ত এই ব্যবস্থা তোমার
মনঃপুতই হবে। তা'ছাড়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যদি
তোমার কিছু অর্থের প্রয়োজন থাকে তাও পাবে তুমি। আমি
যাদের কথা বলছি তাঁরা মস্ত বড় ধনী। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে
পার, তোমার ছেলে বাজার হালেই থাকবে সেখানে।”

না, নিশ্চয়ই তিনি ঠাট্টা করছেন না। মেয়েটির হু'চোখ
জলে ভবে এল। কতদিন সে স্নেহের মুখ দেখেনি। কতদিন
পরে অযাচিত ভাবে সে স্নেহস্পর্শ পেল। এ কি ভগবানের
আশীর্বাদ নয়! হু হু করে তাব চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে
লাগল।

অধ্যাপক তার চুলে স্নেহভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,
“অমন ভেঙ্গে পড়োনা, ভালো করে চিন্তা করে দেখ। আমাব
মনে হয় এতে তোমার মঙ্গলই হবে। ভেবে-চিন্তে কাল এব
জবাব দিও।” এই কথা বলে অধ্যাপক বিদায় নিলেন।

আলো জ্বলে দিতেই মানুষ বুঝতে পারে এতক্ষণ কতখানি
অন্ধকারের মধ্যে সে ডুবে ছিল। যখনই কোন অযাচিত করুণা
আশীর্বাদের মত নেমে আসে, মানুষ তখনই নিজের নিঃস্বতার
কথা বেশী করে উপলব্ধি করে। কাল পর্যন্ত যে ভবিষ্যতের

চিন্তায় চোখে অন্ধকার দেখছি। এবং বি কবে হাসপাতালেব
দেনা শোধ কববে ঠিক পাচ্ছিল না, সে কিনা আজ—! না,
নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখছে। সে চোখ মুছে মনে মনে বললে, বুঝা
কৈদে মব কেন? এ স্বপ্ন ছাড়া আর কি?

স্বপ্নের ঘোব কাটতে না কাটতে একজন ধানী এসে জিজ্ঞাসা
কবল আহাবেব পব সে ক্লাবেটু খাবে, না বিয়াব খাবে। যে
সৌধীন প্রসূতিদেব নিয়ে বাল পর্গন্ত তাবা ঠাট্টা-মশকব
কবেছে সে কিনা আজ তাদেব একজন হতে চলেছে? এ কথা
চিন্তা কবতেও তাব হাসি পেলা।

তাবপব আহাবেব প'লা। তাব চক্ৰে সূক্ষ্ম ভোজ্যবস্ত ও
মুখ মচাব জন্তে ফসা ধপধবে তে যালে এল। বহুদিন প'বে
সে পবিত্রিত্বের সঙ্গে খেল। তাব মনের আকাশ যেন হঠাৎ
বৌদকিন'ণ বলমল কবে উঠে। সেই প্রদাপ্ত আলোকশিখার
হোঁষা লেগে সে যেন যুগপৎ হাসি ও কান্নাব আনগে অভিবৃত্ত
শযে পডল। যখন মানব অধিক দিন শালা-বাতাসহীন অন্ধকূপে
পচে মবে তখন একটি মাত্র নীল দাপশিখা তার চোখ বলসে
দেবাব পক্ষে যথেষ্ট।

সাবা চপুব ধনে সে অধ্যাপনের প্রস্তাবেব কথা চিন্তা কবতে
লাগল। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পাবলো ন', এতে ভাববার
তাব আছেই বা কি। সে যখন নর্দমায় শযে কাতবাছে তখন
একজন সদ্‌দয় ব্যক্তি যেন তাকে সাহায্য কবতে স্নেহ-হস্ত
বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে 'না' বলবে সে কেমন কবে?

পরের দিন অধ্যাপক যখন এলেন তখন একটি মাত্র অম্লবোধের কথাই তার মনে এল—তারা যেন তাব পরিচয় জানবার জন্তে জিদ্ না কবেন। অধ্যাপক গোঁপে তা দিয়ে, বাড়ি নেড়ে বললেন, “সে জন্তে তাঁদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।” অধ্যাপক এমন ভাবে কথাটা উড়িয়ে দিলেন যেন অমন একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান আব সময়েব অপব্যবহার করা—একই কথা। মেয়েটির মনে হ’ল, তাব বৃকে কে যেন একটা ছোট্ট ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। যেমন করে হোক তাকে উঠতে হবে—বাঁচতে হবে। স্তববাং এ প্রস্তাবে সে প্রসন্ন মনেই রাজী হ’য়ে গেল।

প্রফেসর উঠে পড়ে বললেন, “কাল কিন্তু তাবা এসে ক্ষুদে যুবরাজকে নিয়ে যাবেন। তোমাকে কিছু অর্থও দিয়ে যাবেন সেই সঙ্গে।”

অধ্যাপক চলে যেতে ৪৭ নম্বর গুয়ে পড়ল। ‘অর্থ’, ‘স্বাধীনতা’ প্রভৃতি ভাল ভাল কথাগুলো তখনও তাব মাথাব ভেতর ঘুরছিল। সে নিশ্চিন্ত হ’ল। ভাবলে, এ পৃথিবীতে ভগবান তাহলে সত্যিই আছেন! আনন্দের প্রথম শিহরণ কেটে যেতে এতক্ষণে তার মনে পড়ল, এইবাব শিশুটিকে কিছুক্ষণ আদর করা দবকার। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র অবশিষ্ট আছে। সে শিশুটিকে নিজের কাছে আনিয় কোলে ক’বে তাকে ঘুম পাড়াল। তারপর একদৃষ্টে তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে! দেখতে দেখতে তার স্তব

মাতৃহ হঠাৎ উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তার মন স্নিগ্ধ মাতৃবসে নিসিক্ত হয়ে গেল। তার চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রুধারা নেমে এল। তার ক্ষুদ্র নির্দোষ শিশুটি যে অতঃপর সমস্ত অভিশাপ লঙ্ঘন ক'বে নির্বিरोধ জীবন যাপন করতে চলেছে, এ কথা চিন্তা করে তার চোখের জল আর বাধা মান্তে চাইল না।

ক্রমে বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। এবার তাঁরা ছেলেটিকে নিয়ে যাবেন। শিশুটিকে হাসপাতালের পোষাক খুলে দিয়ে স্তন্যদ্বয় ফুলকাটা পোষাক পড়ান হয়েছে। শেষবারের মত তাকে একবার মায়েব কোলে দেওয়া হয়েছে। মা শিশুটিকে কোলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখছে, ময়লা জামা পড়া গবাব ছেলেটি তার হঠাৎ কেমন বড়মানুষী পোষাক পড়ে রাজপুত্র সেজে বসেছে। এই পোষাকগুলি হয়ত তার নতুন মায়ের নিজের হাতে সেলাই করা পোষাক।

সে হেসে ছেলেকে বিদায় দিল। তাব ছোট্ট গাল দুটি অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে, “খোকা, সোনা আমার, আর হয়ত আমাদের দেখা হবে না। নতুন বাপ-মায়ের কাছে লক্ষ্মীটি হয়ে থেক, বাপ আমার!

ছেলেটিকে নিয়ে যাবার পব সে বহুক্ষণ ধরে নিঃসারে মরার মত পড়ে বইল। তারপর অকস্মাৎ মুখ পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অধ্যাপক যেন অন্তরালে বসে এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিলেন। এতক্ষণে তিনি ঘরে ঢুকে একগোছা নোট মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, “আমি

তোমাকে, বিশেষ করে তোমাব ছেলেকে তাব এই মৌভাগ্যের জন্ত অভিনন্দন জানাচ্ছি।” তাবপর তিনি যে সব ছেলেরা এই হাসপাতালে জন্মেছে তাদের ভাগ্যহত ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অনেক সহানুভূতিব কথা বললেন। তাবপর কিছুক্ষণ নৌবে অপেক্ষা করে তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন, “নিজেব কথা ভেবেচ কিছু? এখান থেকে ছাড়া পাবাব পর কি কববে স্থির করেছ?”

সজল চক্ষু মার্জনা কবে মেয়েটি উত্তর দিলে, “এখনও তেমন কিছু ঠিক করিনি।”

“ধব, যদি কোন ব্যবস্থা কবে দেওয়া যায় তোমাব জন্তে? যেমন ধব, একজন ধনী নবভৈজিয়ান বিপত্তীকেব বাড়ীতে যদি তোমাকে ‘হাউস-কিপাবেব’ কাজ দেওয়া হয়, নেবে কি?”

মেয়েটি ভাবলে, এখন বেশ কিছুদিন বাড়ীব নাম মুখে আনা চলবে না। অতএব অধ্যাপকেব এই প্রস্তাবটিতে সে যেন কৃতজ্ঞ বোধ করলে। ভাবলে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সত্যিই খুব দয়ালু। অধ্যাপকও মেয়েটিব কপালে ছ’ একটি স্নেহেব টোকা দিযে সেদিনেব মত বিদায় নিলেন।

কয়েক দিন পর। সন্ধ্যার অন্ধকারে হাসপাতালেব উঠানে একখানা গাড়ী এসে দাড়াইল। একজন শীর্ণ, পাণ্ডুব স্ত্রীলোক সেই গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসল। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুক্ষ বাগানে-ঘেরা সেই গেট-ওয়ালা বাড়ীটাব দিকে

সে শেষবারের মত একবার তাহিয়ে দেখলে। তার মনে হতে লাগল, কত দীর্ঘ দিনই না সে সেখানে কাটিয়ে গেল।... এখন মেয়েদের খাবার দেবার সময় হয়েছে। সেই একঘেঁয়ে পরিজ্ঞ আর নীলচে ছুখ। এখানকার সেই সব ছুর্ভাগা স্ত্রীলোকদের কি সে কোন দিন ভুলতে পারবে এ জীবনে?

সশব্দ রাস্তাঘাট অতিক্রম ক'রে সে চলেছে। এখন তাব গন্তব্যস্থল সেই মেয়েটির বাড়ী—যেখানে সে সর্বশেষ আশ্রয় নিয়েছিল। আজকের রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে।

সে রাত্রে সে তাব ক্ষুদ্র অপবিসর ঘরটিতে বসে মা'কে চিঠি লিখতে বসল। লিখলে যে তার স্কুলের পড়া শেষ হয়েছে। স্কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রী হিসেবে সে স্কুইডেনে একজন ধনী, নিঃসন্তান রুদ্ধের বাড়ীতে হাউস-কিপাবের চাকরী পেয়েছে। মা-বাবা যেন তার জন্তে দুঃখ না করেন। চাকরিটি সম্মানজনক বলেই সে তা' গ্রহণ কবেছে। সর্বশেষে সে লিখলে, তাব মাইনেব টাকা থেকে সে কিছু অগ্রিম পেয়েছে—তাই থেকে যৎসামান্য কিছু মাকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিচ্ছে। তিনি যেন গ্রহণ করেন। চিঠিখানা শেষ করে সে ভাবতে বসল, এই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার ভূমিকা তার জীবনে কোনদিন শেষ হবে কি? বহুদিন পর সে-রাত্রে সে প্রাণভরে ঘুমিয়ে বাঁচল।

পাঁচ

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে মেয়েটি একদিন ট্রেনে চেপে বসল।

স্বাভাবিক প্রদেশের ভেতর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে সোজা দক্ষিণমুখে। গোলাবাড়ী আর তুসার-ঝরা লালচে মাঠের গা-বেয়ে, আবার কখনও বা ছোট ছোট ফার্ম গাছে ঘেবা সমতলভূমির ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে।

গত কয়েকদিন তার কেটেছে জিনিষপত্র কেনা-কাটায় আবঁধা-ছাঁদায়। যাক্ চেহারাটা যে চলনসই করতে পেরেছে এতেই সে খুসী। এ ক’দিনে প্রফেসরের নির্দেশ মত মন্ট-মিঙ্ক, স্টাউট আর টাটকা দুধ খেয়ে তার শরীরের বেশ উপকাব হ’য়েছে। এখন নিজেকে বেশ শক্ত-সামর্থ্য বলে মনে হচ্ছে।

এতদিন পরে সে এই সহর ছেড়ে চললো। কতদিন তার মনে হয়েছে এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল তাকে! কত না ঝড় এ ক’দিনে বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। ইদানিং আবার হাসপাতালের বিভীষিকা দুঃস্বপ্নের মত চেপে ধরেছিল তাকে। ...এখন সে চলেছে দূরে, বহু দূরে—যেখানে গিয়ে সে দুশ্চিন্তা ও নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে বলেই তার বিশ্বাস।

তার মনে হতে লাগল, সে যেন এতদিন পরে সত্যিই নিশ্চিত অঙ্ককার থেকে আলোর রাজ্যে পা দিয়েছে। মনে সে এক আনন্দ-শিহরণ অনুভব করছে। দুশ্চিন্তার ছেঁড়া জাল মাঝে

মধ্যে যে তাকে উদ্বিগ্ন না করছিল, তা' নয়, কিন্তু আক্রমণের তীব্রতা আজকাল অনেকাংশে কমে এসেছে।...গত একমাস যাবৎ সে পিতা-মাতার কাছ থেকে কোন চিঠি-পত্র পায় নি। সে মনকে এই বলে প্রবোধ দিল যে সেটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র - তা'তে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এখন থেকে সে অভীতকে বিস্মৃত হয়ে খুসী হয়ে উঠতে চায়। সে যেন প্রায় জাহাডুপি গ'তে হতে বেঁচে গেছে। এখনও সে যদি খুসী হয়ে উঠতে না পারে, ত খুসী আর হবে কবে ?

জানাল: দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে দেখলে, ভিজ়ে ঘাস ও গাছ-পালাব ওপরে সূর্যকিবল পিছলে পড়ছে। যে কোন আলোক সংক্ৰান্ত দেখলেই আজকাল যেন তার ছেলের কথা মনে পড়ে যায় !

মধ্যরাতে ট্রেন তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছল। ছোট্ট একটি সহর। সহরের সমস্ত আলোকমালা তখন নির্বাপিত হয়েছে। চাদের আলোয় ধারে-কাছেব ছোট্ট ছোট্ট কাঠেব বাড়ীগুলিকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। যে ঘোড়ার গাড়ীটি তাকে নিতে স্টেশনে এসেছিল সেটিতে সে সমস্ত মালপত্র সমেত চড়ে বসল।

একটি ঘন বনে ঘেবা উপত্যকাভূমি দিয়ে গাড়ী আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। পাশে বয়ে চলেছে শব্দময় ছোট্ট একটি গ্রাম্য নদী। ভূষাৱাছাদিত রাস্তার ওপর দিয়ে চলার জন্তে গাড়ীর চাকা থেকে এক ধরণের ঘর্ষন শব্দ উঠছে। বেগবান অশ্বের খুরের আঘাতে রাস্তার জমে-ওঠা বরফ চারিদিকে রেণু রেণু

হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পব গাড়ী একটা বাগান-ঘেবা বড় অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল।

দবজায় গাড়ী দাঁড়াতেই গৃহস্বামী হের ক্ল্যাটেন তার হাত ধরে নামালেন। ডিনাব প্রস্তুত ছিল; গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে গিয়ে ডাইনিং রুমে বসালেন। পথে কোনবকম কষ্ট হয়েছিল কিনা ইত্যাদি মামুলি প্রশ্নের পর বললেন, “ভাল কথা, আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত আপনার নাম জানতে পারিনি।”

এ কথা শুনে যুবতীটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে সঙ্কুচিতভাবে উত্তর দিলে, “আমার নাম রেগিণা—রেগিণা অ্যাজ্।”

বহুদিন পরে এই প্রথম সে তার নাম নিজের মুখে উচ্চারণ করল। তাব নিজেরই কাণে কেমন যেন অদ্ভুত শোনালা নামটা। কিন্তু হের্ ক্ল্যাটেন অতঃপর ক্রিষ্টিয়ানার অগ্ন্যাত্ত খববা-খবর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন।

হের ক্ল্যাটেনের বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। বিশাল সুগঠিত দেহ, মাথাভরা টাক এবং খড়্গানাসার নীচে একজোড়া পুক, কটা গোঁপ। সবশুদ্ধ লোকটিকে প্রথম দর্শনেই বেশ শাস্ত ও সহৃদয় বলেই ধারণা জন্মে। তিনি গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল হ্যামারে। যখন তিনি কুড়ি বছরের যুবক তখন স্পেনের একটা অফিসে কেরানীব চাকরী নিয়ে ঢুকে পড়েন। ভাগ্য তাঁর বরাবর সুপ্রসন্নই ছিল। মাত্র গত বৎসর কাঠের কারবারের জন্তে এই জঙ্গল সমেত বিশাল জমিদারীটা কিনেছেন।

কিন্তু গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে যা .এ পর থেকে তাঁর আর বিষয়-কর্মে মন নেই—স্থির বসেছেন সব বেচে দিয়ে নবওষেতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস কববেন।

বেগিণী ভুলে গেল যে এখনও পর্যন্ত ভদ্রলোকটির সঙ্গে তার ভাল কবে পরিচয়ই হয়নি—এমন কি তাঁকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বললেই হয়! তাঁর সহজ সবল ব্যবহারে বেগিণীর সমস্ত সংশ্লিষ্ট একমুহূর্তে দূরীভূত হ'ল। ভদ্রলোকটি যে তাঁকে আপ্যায়নও করলেন না আবার অবজ্ঞাও দেখালেন না—এতে বেগিণী খুব খুসী হ'ল। কিন্তু পবমুহূর্তেই ফ্লাটন যা জিজ্ঞাসা কবে বললেন তার জন্য বেগিণী মোটেই প্রস্তুত ছিল না, প্রশ্ন শুনে সে চমকে উঠল।

হের ফ্লাটেন কপালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলেন, “বারসেলোনায় আজ্ নামে নো-বাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট-এব সঙ্গে একবার আলাপ হ'য়েছিল। একটি নবউইজিয়ান যুদ্ধজাহাজে তখন তিনি কর্মবত ছিলেন। আপনি কি তাঁর কোন আত্মীয় হন?” এই কথা বলে তিনি বেগিণীর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে বসলেন।

সেই মুহূর্তে বেগিণীর মনে হ'ল পৃথিবী যেন ছলছে। মিমথ্যা-ভাষণে যে অভ্যাস এতদিন ধরে সে বশ্ত কবেছিল, এব'বও সে সেটাকে কাজে লাগালো। অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক গলায় সে উত্তর দিল, “আজ্ঞে না, আমার বাবা ক্ষেত-খামাবেন কাজ করতেন।”

পাইপে তামাক ঠাস্তে ঠাস্তে ভদ্রলোক বললেন, “বটেই ত ! বটেই ত ! আমারই ভুল । ও রকম বোকাম মত প্রশ্ন করাট উচিত হয়নি আমার । কালই ত নরউইজিয়ান একটি খবরের কাগজে দেখলাম যে অ্যাঙ্ক্ নামে সেই ভদ্রলোকটি সমুদ্র উপকূলের কোথায় যেন আলো-ঘরের রক্ষক ছিলেন— হঠাৎ মারা গেছেন । আপনি যদি তাঁর মেয়ে-টেয়ে কেউ হতেন, তা’হলে কি আর আজ আপনাকে এখানে দেখতে পেতাম ?”

রেগিণা পড়ে যাচ্ছিল ; কোন রকমে টেবিল ধবে সামলে নিল । সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল যাতে সে সংজ্ঞা না হারায় !

হের্ ফ্যাটেন অত সব লক্ষ্য না ক’রে বললেন, “আজকে এই পর্যন্তই । আপনি নিশ্চয়ই পথশ্রমে ক্লান্ত বোধ করছেন । এখন আপনার শুয়ে পড়া উচিত । পরিচারিকা আপনাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দেবে ।”

এই কথা বলে হের্ ফ্যাটেন শুভরাণী জানিয়ে খাবার ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন ।

ছয়

ভূগর্ভ খনিতে কাজ কবে যে শ্রমিক তাব কাছে পৃথিবীর আলোকবেশ্যক যেন এক সঞ্জীবনীশক্তির আধার বলে মনে হয়। অন্ধকার পাতাল থেকে সে যখন ক্রমশঃ ওপরেব দিকে উঠতে থাকে তখন তাব মন এক অনিবার্য আনন্দে আপ্লুত হ'তে থাকে। যতই খনির তিমির-অন্ধকার দূরে গিয়ে ধবলীর আলো নিকটবর্তী হয় ততই সে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন সে সম্মলভূমিতে উঠে এসে সেখানকার স্বাধীন মুক্ত মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে যায় তখনই সে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করে যে সকলেই যেন তাকে ভূগর্ভের শ্রমিক বলে ঘণা করে দূরে সরে যাচ্ছে। যতই সে ধুয়ে মুহে ফিট-ফাট হে'ক না কেন, পাতালের কাদামাটি যেন হৃদয়ভাবে তাব সব অঙ্গে লেপটে থাকে। . . বেগিণাবও আজ সেই অবস্থা।

পবদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে বেগিণাব মনে হ'ল আব শুয়ে থাকলে বেদন হয় সকলের কাছে সে ধবা পড়ে যাবে। শুধু যে এখনি নীচে যাওয়া দবকার তাই নয়, তাকে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন তাব কিছুই হয়নি। এই চিন্তা করে যতই সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল, ততই এক নিকন্দম জড়তা তাকে আঁকড়ে ধরে জড়িয়ে ধরল।

যতদিন তাব সমস্তাগুলি জটিল ছিল, ততদিন তা' থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তাব মন আকুলি-নিকুলি করত। এখন

আবার সে পায়ের নীচে শক্ত মাটির ছোঁয়া পেয়েছে কিন্তু তবুও তার মন নিশ্চিন্ত হচ্ছে কই? ভবিষ্যৎ তার কাছে আগের মতই ঝাপসা বোধ হচ্ছে কেন? এখন ত সে তার পিতার অস্ত্যেষ্টিতে গিয়ে যোগ দিতে পারে এবং তার ভাগ্যহীনা মায়ের কাছে গিয়ে বরাবর বাস করতে পারে। কিন্তু তা' তার কাছে অসম্ভব বলে বোধ হচ্ছে কেন? সে বুঝতে পাবছে না কেন সে এখনও ভাঁরুর মত আত্মগোপন করে থাকবে! এখন আর কেন সে আগের মত সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে না! অন্ধকার উপত্যকাভূমি পার হ'য়ে এই ও সে সূর্যকিরণ-উদ্ভাসিত পর্বত-শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে। তবে, তবে, তবে?...

রেগিগার ধারণা ছিল, নতুন পরিবেশে গিয়ে হয়ত সে পুনরায় সূর্যের নৃত্য দেখতে পাবে। কিন্তু এখন দেখলে, তার ভাগ্যে সূর্যের স্থান নেই। আবার পূর্বের মতই তাকে সাবধানে প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে তার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ হয়ে না পড়ে! সে ভেবে দেখলে তার মায়েরও অনন্ত দুঃখের জীবন! এই দুঃসহ জীবনযাত্রাই কি সে কামনা করেছিল?

রেগিগা নীচে নামবার ঙ্গা সংক্ষেপে প্রস্তুত হয়ে নিল। আয়নার সামনে শেষবারের মত দাঁড়িয়ে দেখলে, প্রসাধন সত্ত্বেও তার মুখখানাকে কেমন ভিজ্জে-ভিজ্জে, ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডাজলে তোলালে ভিজিয়ে সে বেশ করে আরক্ত চোখে-মুখে ঘসে নিলে। দেখলে, এবার তাকে অনেকটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

রেগিণা নীচে নেমে এসে দেখলে, হের্ ফ্ল্যাটেন ইতিমধ্যেই অফিসে বেড়িয়ে গেছেন। ঝকঝকে বায়না ঘরটিতে দু'জন পবিচারিকা কাজ করছিল। যে মেয়েটি এতদিন হাউস-কিপাবেব কাজ চালাচ্ছিল সেই মেয়েটিই প্রাত্বাশেব পর বোগিণাকে সমস্ত ঘব-দোর-গৃহস্থালী দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল।

দ্বিপ্রহরে ফ্ল্যাটেনেব সঙ্গে খেতে বসে বেগিণা নীববে নতমুখে আহাব সমাপ্ত করে ঘুমাব অছিলায় পাশেব একটা ছোট কামবাতে গিয়ে চুবল। জানালা দিবে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, বৃক্ষসঙ্কুল উপত্যকাটিকে ভাবী সুন্দর দেখাচ্ছে। দূবেব ফাঙ্ক্টরীর উঁচু চিম্নী থেকে স্ক্রাণ একটা ধোঁয়াব কুণ্ডলা উঠছে। সেইদিকে একদৃষ্টে নিরুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেগিণাব কেনন যেন পারণা হ'ল, তাব বাবা যেন সমস্ত কলঙ্কেব কথা জান'ত পেবে মনোকষ্টে ও ভগ্ন-হৃদয়ে মা'ব গেছেন। সম্ভানদেব উপযুপযি দুবাবহাব কত আব সস্ত হয় মান্তসেব ?

যতই দিন যেতে লাগল ততই বেগিণাব ভয় হ'তে লাগল, এবাব বুঝি তাব প্রকৃত পবিচয় ফাঁস হয়ে যান। অপরিচিত লোকগুলোব চোখে যেন সন্দেহেব ছায়া লুপ্তে, মুহূর্তের অসাবধানতায় সব কথাই বুঝি প্রকাশ হ'য়ে পড়বে! সুতবং সে হেসে-খেলে, চাকব-বাকবদেব সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা যবে, ফ্ল্যাটেনেব সম্মুখে প্রফুল্লতার ভাণ কবে সাবধানে দিন কাটাতে লাগল।

প্রতি সন্ধ্যায় কর্মক্রান্ত ফ্ল্যাটেন বাড়ী ফিরে এসে আহাবাদির পব বই ও পাইপ নিয়ে তাঁর মৃত পত্নীব ছোট পড়াব ঘরটিতে

গিয়ে ঢেকেন। রেগিণা লক্ষ্য করলে, তাঁর সমস্ত সত্ত্বা যেন তাঁর প্রেমময়ী পত্নীর ধ্যানে মগ্ন। স্ত্রীর ঐ ছোট্ট, শাস্ত, গৃহ-কোণটি যেন তাঁর কাছে একটি শুঁচ-শুভ্র মন্দির বিশেষ!

কচিং-কদাচিং ফ্ল্যাটেন তাঁর ছ'একজন বন্ধুবান্ধবকে ডিনাবে নেমতন্ন করেন। কাঠ, বন আর বিদেশী বাজার দর নিয়ে তাঁদের আলোচনা চলে।...সময় সময় ফ্ল্যাটেনকে কর্ম-ব্যপদেশে সহরের বাইরে যেতে হ'য়। বেগিণা কৃতজ্ঞচিত্তে লক্ষ্য করলে, ফ্ল্যাটেন আর ভুলেও কোন দিন তার বাড়ী-ঘর বা আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করেন না। তাঁর গৃহস্থালীর তদ্বির তল্লাশের ভার সম্পূর্ণভাবে রেগিণাব হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এমনি নিকপদবে দিনগুলি কেটে যেতে লাগল।

একদিন খাবার টেবিলে ফ্ল্যাটেন হঠাৎ রেগিণাকে প্রশ্ন করে বসলেন, “অ্যাজ্, জায়গাটা কি তোমার ভাল লাগছে না? আমি লক্ষ্য করছি, দিনের পব দিন তুমি কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছ। কাল কয়েক জায়গায় আমার যাবার কথা আছে—চল না আমাব সঙ্গে। এই সূত্রে অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়ে যাবে’খন।”

রেগিণা নানারকম কাজের ওজর দেখিয়ে প্রস্তাবটা এড়িয়ে গেল। বললে, শরীর তার বেশ ভালই আছে...। কিন্তু বলেই বুঝল, কথাটা কেমন যেন বে-খাপ্পা, নিরস জবাবদিহির

মতই শোনাচ্ছে। ক্ল্যাটেন যে বার বার তার দিকে চেয়ে দেখছেন, সেটা অনুভব করে রোগিণার ভয় হ'ল। ভাবলে তিনি হয়ত তীক্ষ্ণ-সন্ধানী দৃষ্টিতে তার জীবনের প্রকৃত রহস্যটি উদ্ঘাটন করেই ফেলবেন।

একদিন রেগিণা তার মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল। পেয়েই বুঝল এর পূর্বেও তিনি একখানা পত্র দিয়ে-ছিলেন কিন্তু সেখানা তার হস্তগত হয়নি। পিতার শেষকৃত্যে বাড়ী যায়নি বলে মা খুব দুঃখ করে পত্র লিখেছেন। অবশ্য তিনি যে কিছু সন্দেহ করেছেন, চিঠি পড়ে তা' মনে হয় না। সুতরাং পিতাও যে মৃত্যুর পূর্বে কিছু জেনে যাননি, রেগিণা এ বিষয়ে একপ্রকার নিঃসন্দেহ হ'ল।

সেই বৃহৎ অট্টালিকার তিন-তলার একখানা ঘর রেগিণাব জন্মে নির্দিষ্ট হ'য়েছে। বসন্তের হালকা সন্ধ্যায় রেগিণা নিজের ঘরে দোলানে চেয়ারটিতে চুপটি করে বসেছিল। দূরে ফার-গাছে ঘেরা উচু-নীচু পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছে। সবশেষেব উচু পাহাড়টি সন্ধ্যা আকাশের রক্তিমভায়ে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ফ্যান্টারীর শব্দ থেমে গেছে, কেবল চিম্নিগুলো থেকে নির্গত অল্প-সল্প ধোঁয়া দূর শূন্যে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই নিখর সন্ধ্যা-সুন্দরতার মধ্যে নদীর কুলু-কুলু ধ্বনিটুকু স্থললিত সঙ্গীতের মূর্ছমার মতই রেগিণার কানে ভেসে এল।

রেগিণা কেমন এক ধরনের ভাবালুতায় ডুবে গেল যেন। তার মনে হ'তে লাগল যে তরুণ চিন্তা জয় করার দিন তার চলে

গেছে। নিজেকে কাবও বধুরূপে কল্পনা করাব ক্ষমতাও যেন হাবিয়ে ফেলেছে সে। যৌবনের স্বপ্ন দেখাব দিন তাব জীবনে আব বোধ হয় ফিবে আসবে না।

এইভাবে দিন গড়িয়ে চলল। বেগিণা সর্বদা সযত্নে হাসি-খুসী ব মুখোস পড়ে চলা-ফেবা করতে লাগল। কিন্তু যাব গোপন ব্যথাব স্থান আছে, তার সর্বদা ভয় পাছে মর্মস্থানে কেউ আঘাত করে বসে। বেগিণারও তেমনি সর্বদা মনে হতে লাগল হেব ফ্ল্যাটেন বোধ হয় তাব সব কথাই জেনে ফেলেছেন।

মান্নে-মধ্যে বেগিণা ভাবে, সেই খাম্খেয়ালী অধ্যাপকটি কেনই বা তাব প্রতি এত দবদী হয়ে উঠলেন এবং কেনই বা বেছে বেছে তারই ওপব অযাচিত অমুগ্রহ বষণ কবতে লাগলেন। তবে কি তাঁব কোন আত্মীয়ের অদৃশ্য ইঙ্গিত ছিল এব ভেতব ? এমনও হতে পারে যে তাব অলক্ষ্যে পর্দাব অস্তুরালে যে অভিনয় অভিনীত হচ্ছিল ঘৃণাক্ষবেও সে তা' টেব পায়নি। এমনও তো হতে পারে যে তাব নিজেরই কোন আত্মীয় ছেলেটিকে দত্তক নিয়েছেন, তাই সমস্ত ব্যাপাবটা অমন চুপিসাবে সাবা হ'য়েছে। এইকপ নানা অবাস্তব ও উদ্ভট চিন্তা বেগিণাব উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘোবা-ফেবা কবতে লাগল। নিদ্রায়, জাগবণে ও সর্বকমে' এই জটিল চিন্তা-সূত্র নিকট-বান্ধবেব মত তাব সঙ্গ ছাড়তে চাইল না।

ক্রমশঃ রেগিণাব মনে হ'তে লাগল, এই যে এতদিন ধবে

এতগুলি লোক তাকে নানাভাবে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছে, এটা তার পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়। দয়া প্রদর্শনের সে উপযুক্তই নয়। তার মত একজন আত্ম-বিস্মৃত, ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের পক্ষে সমস্ত কিছু অপমান হাসিমুখে সহ্য করা উচিত। যদি ছু'বেলা ছু'মুঠো খেতে পায়, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। তা'হলে সত্যিই কি ছেজের নিয়তি অদৃশ্য হ'লে তাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে? তাব নিজের ইচ্ছাশক্তির কি কোন মূল্য, কোন ক্ষমতাই নেই? নতুবা তাবই বা এমন পোড়া-কপাল হবে কেন?

তারপব ক্রমশঃ বসন্তকাল এগিয়ে এল। জানালার ফাঁকরে ফাঁকরে চড়ুই পাখীদের বাসা বাঁধবাব সাড়া পড়ে গেল। নদীর ত'পাশেব পথেব ধাবে ধারে নানাবর্ণের পুষ্পগুলি কার্পেট বোনা স্তর করে দিলে। সূর্যেব খরতাপ দিন দিন বেড়েই চলল। বেগিণী সমস্ত চিন্তা মন থেকে ঝেবে ফেলে দিয়ে পুনরায় খুসী হবার জন্যে আশ্রাণ চেষ্টা কবতে লাগল। তাব ফলস্ব যৌবন যেন শাসনের ক্রকুটি জোর কবে তাড়িয়ে দিতে চায় যেমন করে অটুট স্বাস্থ্য রোগ-তাপকে অক্রেমে নির্বাসিত করে রাখে।

বসন্ত চলে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এগিয়ে এল। এখন অবসর-সময়ে বেগিণী বাগানেব কাজ করে। ঘাস ও ঝরা-পাতার আমেজে বাতাস যেন ভারী হয়ে এল। ফলের গাছগুলি এখন মুকুলের ভারে অবনত হয়ে এসেছে। এই নির্জন প্রকৃতির কল্যাণে বেগিণী ভুলে যেতে বসল সে কোথায় আছে, কেন

আছে ! তার মনে হ'তে লাগল, এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি যেন তার নিজেরই। সে ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে গাছ-পালা নীল-আকাশ দেখে দেখে আর পাখীর কুজন শুনে শুনে তার অবসর বিনোদন করতে লাগল। এই নিষ্ঠুর, কর্কশ পৃথিবী যেন তার সমস্ত কিছু কদর্য অভিজ্ঞতা সমেত ক্রমশঃ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

একদিন রবিবার দিনাবশেষে বেগিণা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর ফ্ল্যাটেন ছ'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রেগিণা ফ্ল্যাটেনকে লক্ষ্য কবেনি। সে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাগানে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফ্ল্যাটেন ভাবলেন, মেয়েটি সত্যিই অনুপমা সুন্দরী। কয়েক দিন ধরেই তিনি লক্ষ্য করছেন, স্বাস্থ্যসমুজ্জল রেগিণাব দেহশ্রী যেন দিন দিন ফেটে পড়ছে।

অতঃপর ফ্ল্যাটেন প্রত্যহ খাবার টেবিলে অনাবশ্যক ভাবে দেরী করতে লাগলেন। রেগিণাকে দেখলেই তাঁর শোক-সমুপ্ত হৃদয়ের দাবদাহ যেন জুড়িয়ে যেত। সেই কয়েক মুহূর্তের জন্ত তিনি নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের মর্মবেদনা যেন ভুলে যেতেন !

একদিন তিনি স্নেহস্বরে ডাকলেন, “ফ্রেন্সে অ্যাজ্...”

রেগিণা চমকে মুখ তুলে তাকাল। ফ্ল্যাটেন যে সেদিন এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছেন, তা' সে জানতেও পারেনি। রেগিণা এমন করে চমকে উঠল যে মনে হ'ল

বুঝি সে কোন অপরাধমূলক কাজ করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। সে উদ্বিগ্ন, নত মুখে ধীরে ধীরে ফ্ল্যাটেনের কাছে এসে দাঁড়াল। মৃত্ত হেসে বললে “আমাকে কি কিছু বলছিলেন?”

ফ্ল্যাটেন বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই অশ্রুমনস্ক ভাবে হঠাৎ তাব নাম ধবে ডেকেছিলেন। স্তম্ভবাৎ সেই অসাবধান মুহূর্তে হঠাৎ কি বলা উচিত, না উচিত, স্থির কবতে না পেরে আমতা আমতা করতে লাগলেন।

সূর্যেব আভাষ বেগিণাব মুখমণ্ডল রক্তকমলের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। ইদানি আবাব ঈষৎ কৃশ দেহতনু স্বাস্থ্য-সম্পদে অপকণ শ্রী-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সবুজ গাছ-পালাব পটভূমিতে, হালকা রঙেব চিলে-ঢালা পোষাক পরে পটে আঁকা ছবিটির মতই সে সম্ভরণে ফ্ল্যাটেনেব কাছে এসে তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই বিশেষ মুহূর্তে রেগিণাকে ভাবী ভাল লাগল তাঁর। বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে তিনি বললেন, “ফ্রেন্স্ আজ্, এখানে একটানা আব বোধ হয় তোমার ভাল লাগছে না। কালই আমি কয়েক-দিনের জন্যে গুটেনবার্গ যাচ্ছি। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, চলনা আমার সঙ্গে! আমারও একজন সঙ্গী হবে আর খোলা বাতাসে তোমারও মনটা প্রফুল্ল হবে। যাবে কি?”

মাটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেগিণা সলজ্জভাবে উত্তর দিলে, “বেশ ত! চলুন না।”

বড় সহরের পথের ওপর দিয়ে যেতে যেতে রেগিণার ভয় হ'তে লাগল, হঠাৎ যদি পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ! চিন্তাটাকে সে মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারল না। এই ভয়-ব্যাকুলতা ছায়াব মতই তাব সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল।

বাড়ী ফিরে এসে বেগিণা উপলব্ধি করলে, এবাবকাব যাবা তার কাছে মোটেই উপভোগ্য হয় নি। স্বাভাবিক ভাবে আনন্দ উপভোগ করবার ক্ষমতাই যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। চোখের বিভীষিকাই যেন তার নিভাসদ্বী ; পৃথিবীর যেখানেই সে পালিয়ে যাকনা কেন, তারা তাব সঙ্গ কিছুতেই ছাড়বে না।

তা'হলে নিত্য শত শত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আনন্দেব ভাণ করে থেকে কি লাভ ? এই মুখোসটাকে ছিঁড়ে ফেললেই বা কি এমন মহাভারত অন্তর্দ্ব হয়ে যাবে ? কিন্তু এই চিন্তামাত্রই বেগিণা চমকে উঠল ; উচ্ছ্বাসে তার সারা মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সে প্রতিজ্ঞা করলে, না, যেমন করেই হোক, তাকে এই অবস্থা সহ্য করতেই হবে। মা যেন ঘুণাক্ষবেও এ'কথা টেব না পান ! কি হবে আর তাঁব যন্ত্রণা বাড়িয়ে ? নিজের সম্বন্ধে অবশ্য তাব আর ভয় নেই। যে অপমান তাকে অহরহ পশুর্দস্ত করেছে, তার বেশী আব কি-ই বা হবে তার ?

রেগিণার প্রতি ফ্ল্যাটেনের ব্যবহার দিন দিন যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে রেগিণা মাঝে-মাঝে ভীত-সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠত। তাঁর স্নেহের অত্যাচার যেন দিন দিন

বাড়াবাড়িতে দাঁড়াচ্ছে। যখনই তিনি দূরদেশ থেকে ফিরতেন, তখনই তিনি রেগিণার জন্তে কিছু-না-কিছু দামী উপহার কিনে আনতেন। তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন তার প্রতি, যেন সে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী।

বেগিণা চমকে উঠে উপলব্ধি করলে, এইবার বুঝি আবস্ত হ'ল! এইবার হয়ত একদিন রাত্রে তিনি পা টিপে টিপে গোপনে তার শয়নগৃহে গিয়ে হাজির হবেন। সব পুরুষই সমান কিনা! হয়ত প্রথম থেকেই এই চক্রান্তটি ঠিক ছিল। রেগিণা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, ফ্ল্যাটেন আর যদি এক পাও অগ্রসব হন, তা'হলে ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে তাঁর মাথাটি গুঁড়িয়ে দেবে।

একটা প্রশস্ত ঘবে, ফ্লু ফ্ল্যাটেনের একটি বড় সজ্জিত তৈলচিত্র দেয়ালে ঝোলান ছিল। ফ্ল্যাটেন সেই চিত্রটির দিকে প্রায়ই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হত, তিনি যেন তাঁর বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন। সেই ছবির ঠিক নীচে রাখা সোফাটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে তিনি যেন তাঁর অবলুপ্তা প্রিয়াকে অম্লরোধ করতেন, যাতে করে তিনি এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারেন। সেই বৃদ্ধ, অস্বপনভোলা বিপদীকটি এইভাবে প্রত্যহ নিজের সঙ্গে শ্রাণপণে লড়াই করে ক্ষত-বিক্ষত হ'তে লাগলেন।

সাত

রেগিণার মনে হ'ল তার যেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হ'য়েছে। কি প্রয়োজন তার এখানে বসে শ্রদ্ধা কুড়োবার, যখন তার মনের কথা বুঝবার মত একটা লোকও কাছে নেই ?

খেলোয়াড় যে দৃষ্টিতে দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই দৃষ্টিতে রেগিণা একবার তার নিজের অন্তরটাকে দেখে নেবার চেষ্টা করলে। এ পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে এখন থেকে তাব খুব সাবধানে পা ফেলা উচিত। হের্ ফ্র্যাটেনকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া দবকাব হয়েছে এবার। তাতে অবশ্য তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হবেন কিন্তু এতে করে তাঁর চোখে তার নিজের সম্মান বেড়ে যাবে বই কমবে না।

এ পৃথিবীতে কতকগুলি স্ত্রীলোক আছেন যাদের আত্মীয় ভাগ্য ভালই। তাঁরা সহৃদয় বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, সৎ এবং উচ্চ শিক্ষাও পেয়ে থাকেন। সময়মত একদিন তাঁরা মনের মত স্বামীও পান। তারপর যখন তাঁরা পুত্রবতী হ'ন, তখন সংসার আনন্দে ভরে ওঠে। সম্মানের জগ্গে, অর্থের জগ্গে তাঁদের সম্মানকে বিক্রি করে দিতে হয় না। তাঁরাই জানেন দাবা কি করে খেলতে হয়। ভগবানই হয়ত তাদের হয়ে বঁড়ের চাল চলে দেন।

কিন্তু কেউ কেউ আবার খেলায় মারাত্মক রকম তুল করে বসে—যার ফলে তাদের গোটা জীবনটাই ছন্নছাড়া ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। রেগিণা এখন মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, তাঁর জীবনে কিভাবে খেলাটা তার আরম্ভ করা উচিত ছিল। সর্বদা মনে হ’তে লাগল, যদি এটা না হ’ত, যদি ওটা না হত! এই ‘যদির’ গোলকধাঁসায় পড়ে সে দিশেহারা হয়ে গেল।

অতঃপর রেগিণা তার অভাগীনি জননীর কথা স্মরণ করে প্রত্যহ সাক্ষ্য-উপাসনায় যোগ দিতে লাগল। প্রার্থনা করতে করতে তার মনে হ’তে লাগল, মা বুঝি খুব কাছটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রত্যেক রবিবার সে চার্চে যেতে আরম্ভ করলে। চার্চের ঐক্য-সঙ্গীত আর অর্গানের সুস্বাক্ষরে তার মন যেন হৃদয় অতীতে চলে যেত। সমস্ত শোক-তাপ সে নিমেষে ভুলে যেত। অবশেষে ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণই যে আত্মশুদ্ধির শ্রেষ্ঠতম পথ—সে বিষয়ে তার স্থির বিশ্বাস জন্মাল।

প্রতি রবিবারই স্থানীয় চিকিৎসক একজন বৃদ্ধার হাত ধরে চার্চে আসতেন। বৃদ্ধাকে দেখে রেগিণার মনে হ’ত তিনি নিশ্চয়ই ডাক্তারের মা নন; কেননা, তাঁকে দেখে একজন সাধারণ কৃষক-রমণী বলেই বোধ হ’ত। কিন্তু তিনি ও ডাক্তার সর্বদাই একসঙ্গে চার্চে আসতেন এবং পাশাপাশি বসে একই বই থেকে ধর্মসঙ্গীত আবৃত্তি করতেন।

একদিন খাবার টেবিলে রেগিণা জিজ্ঞাসা করে বসল,

“ডাক্তারের দয়া-দাক্ষিণ্যে ত খুবই সুখ্যাতি শুনি। বৃদ্ধাটি কি তাঁরই কোন আশ্রিতা?”

ফ্ল্যাটেন মুচ্কি হেসে উত্তর দিলেন, “ওটি ডাক্তাবেব মা। বৃদ্ধা অবশ্য বিবাহিতা নন, অতি কঠোর পবিত্রমে তিনি নিজের ছেলেটিকে মানুষ কবে তুলেছেন। এতদিনে তাঁর সমস্ত কষ্ট সার্থক হয়েছে।”

বেগিণা হচ্চকিয়ে গিয়ে বললে, “বলেন কি?”

“হ্যাঁ, ডাক্তাবটি সর্বত্রই বৃদ্ধাকে সঙ্গে কবে নিয়ে যান এক সকলকেই গর্বভরে নিজের মা বলে পরিচয় দেন। তাঁদের উভয়ের সম্পর্কটা তিনি কখনই গোপন করতে চেষ্টা করেন না। বেচারী বৃদ্ধা যতই অসুস্থবর্তিনী হ’তে চান, ডাক্তার ততই তাঁকে পাঁচজনের সামনে টেনে নিয়ে আসেন। ডাক্তাব এতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না।”

রেগিণাব হঠাৎ নিজের হতভাগ্য ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। সে খেতে ভুলে গিয়ে কেমন যেন আনমনা দৃষ্টিতে সম্মুখপানে চেয়ে রইল। ফ্ল্যাটেনের দিকে আড়চোখে চেয়ে চিন্তা করতে লাগল তাঁর কথাগুলির মধ্যে কোন অলক্ষ্য ইঙ্গিত আছে কি না। হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল এমনি ভাবে অকস্মাৎ রেগিণা জিজ্ঞাসা কবে বসল, “আচ্ছা, লোকেরা তাঁদের নিয়ে কিছু বলা-বলি করে না?”

“লোকেরা কি বলে, না বলে, ডাক্তারের সে বিষয়ে ভ্র-ক্ষেপ মাত্র নেই।”

উত্তর শুনে রেগিণা হো-গো কবে হেসে উঠল।

পরেব ববিবাব থেকে রেগিণা চার্চে গিয়ে ডাক্তার ও ত'ব মাব ঠিক পেছনেব জায়গাটিতে বসত। এঁদেব কথা চিন্তা করতে কবতে সে প্রায়ই ধর্মসঙ্গীত গাইতে ভুলে যেত। বুদ্ধাটিব প্রতি তাব সত্যিকাবেব শ্রদ্ধা হতে লাগল। তিনি য় শুধু এই পৃথিবীব সমস্ত দগু ও অভিশাপকে শিবোধার্য কবে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি তাঁব সমস্ত শক্তি ও সাহস দিয়ে তাব নিজেব সম্মানকে স্বীকার কবে নিয়েছেন এবং আজ এই মুহূর্তে তিনি তাঁব মহান গৌরবেব পাশে গর্ভবে বসে আছেন।

কিন্তু সে নিজে? সে অর্থের বিনিময়ে নিজের সম্মানকে বেচে দিয়েছে। বেগিণা চিন্তা কবতে চেষ্টা কবলে, সে অবশ্য য তাব পক্ষে অল্প কিছু করা সম্ভব ছিল কি না।

এইকপ নানা অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তা বেগিণাব অ'প'ত হাসোজ্জল জীবনধাবাব মধ্যে এক সর্বনাশা জাল বুনে চলল। অবশেষে একদিন সে কিছু টাকা হাসপাতালের অধ্যাপকটিব নামে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলে, টাকাটা যেন তিনি সেই অজ্ঞাত দম্পতীটিব কাছে পাঠিয়ে দেন। ..তবও তাব মন থেকে গ্লানিব ও আগ্নেয়িকাবেব জেব কাটল না। সৃণিত কার্যেব দ্বাবা য় হস্ত সে স্বেচ্ছায় মসিলিপ্ত কবেছে, এখন শত প্রক্ষালনেও সই অঙ্গাবচ্ছ হাত্ত থেকে মেটাতে চাইল না। তাবপব থেকে সে চাচে যাওয়াই ছেড়ে দিলে। মাতা-পুত্রেব সেই পবন বমণীয় দৃশ্যটি তাব রুচিক-দশনেব মতই অসহনীয় বোধ হ'তে

লাগল। রেগিণার বিশেষ কোন বান্ধবী ছিল না স্মৃতরাং অবসর-বিনোদনেব কোন সহজ পথ সে খুঁজে পেল না। কাঁহাতক আর দিনের পর দিন একই কাজে লিপ্ত থেকে সময় কাটানো যায়? কত আর মুখে মুখোস এঁটে মনের প্রকৃত ক্ষতস্থানটিকে গোপন করে বাঁচা চলে? রেগিণাব প্রাত্যহিক জীবনে সেই একটা প্রধান সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াল।

এখন থেকে প্রায়ই সে অগ্রমনস্ক হয়ে ভাবতে চেষ্টা কবত, তার ছেলেটি কোথায় এবং কেমন অবস্থায় আছে। এখন প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত জানালার ধারের সেই দোলানে চেয়ারটি অনবরত দোলে। পশ্চিমদিকের নীল-পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রেগিণা আপন মনে কি যেন ভাবে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে যেন দেখতে পায়, তার শিশুটি অনিমেধ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

এতদিন রেগিণার ভবিষ্যৎ যেন গভীর অন্ধকাবে আচ্ছন্ন ছিল কিন্তু এতদিনে হঠাৎ সে যেন একটি ক্ষীণ আলোকরেখা দেখতে পাচ্ছে। ক্ষীণ শিখাটি যেন ক্রমশঃ আরও উজ্জ্বল হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই বিকীর্ণ প্রোজ্জ্বল আলোকশিখা ঘিরে নানা সুখস্বপ্ন রেগিণার মনে উদ্ভিত হতে লাগল।

আট

ক্রমে হেমন্তকাল এসে গেল। আপেল ও পিয়ার বৃক্ষগুলি অসংখ্য লাল হলদে ফলের ভারে অবনত হয়ে এল। গাছের সবুজ পাতাগুলিও রৌদ্রকিরণে ঝকঝক করতে লাগল। নিম্নল ও রৌদ্রস্নাত নভোমণ্ডলেব গায়ে দূর দিগন্তের ফার বৃক্ষেব অগ্রভাগগুলিকে তুলিতে আকা ছবিব মত সুন্দর দেখাতে লাগল। দক্ষিণদিকেব পাহাড়গুলি যেন দূরে সমতলভূমিতে মিশেছে এবং তারপব উভয়ে একসঙ্গে দূর-দিগন্তেব সমুদ্রবেল য় গিয়ে বিলীন হয়েছে।

তাবপর এল ঝড়-বাতাসেব দিন। সন্ধ্যাবেল'য বেগিণী জানালা বন্ধ ক'রে আলোর সামনে বসে বসে ভাবে। এখন নিজেকে অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে তাব। অত বড় অট্টালিকার নিকঙ্ক নিস্তব্ধতার মধ্যে তার শ্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ...রেগিণী সারা সন্ধ্যাবেলাটা সেলাই নিয়ে বসে থাকে আব হের ফ্ল্যাটেন তাঁর স্ত্রীব ছোট্ট পড়বার ঘরটিতে বই কে'লে নিয়ে বসে থাকেন। এই-ই তাঁদের দু'জনের দৈনন্দিন কার্যতালিকা।

একদিন সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটেন খাবাব ঘরে উঠে এসে বললেন, “ফ্রুটেন অ্যাজ, এ রকম একা একা বসে থেকে তোমাব শ্রাণ কি হাঁপিয়ে ওঠে না? এস না, দু'জনে একত্র বসে খানিক গল্পগুজন ক'রে এই নির্জীব একাকিত্বটা ঘোচান যাক।” বেগিণী আস্তে আস্তে উঠে ফ্ল্যাটেনের ছোট্ট ঘরটিতে এসে বসল। তার মনে

হ'ল, সেই ছোট্ট ঘরটির সঞ্চিত উত্তাপ বেশ যেন আরাম-দায়ক । তারপর হেমস্তের সেই সুন্দর সন্ধ্যাকালে সেলাই কবতে করতে ও বই পড়তে পড়তে কোন এক সময় তারা পরস্পরের প্রতি যেন এক গভীর অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করলে । মনে হ'ল বিদেশ-বিভূঁয়ে ছ'জন সম-ব্যথী যেন বহুদিন পর একত্র মিলিত হ'য়েছে । ফ্ল্যাটেন তাঁর যৌবনের কুচ্ছসাধনার কথা অকপট হৃদয়ে বলতে লাগলেন আর রেগিণা তা অত্যুৎসাহে শুনতে লাগল । রেগিণার কেমন যেন ভয় করতে লাগল, এবাব বুঝি ফ্ল্যাটেন তাব অতীতের কথা জিজ্ঞাসা করে বসেন । কিন্তু সে বিষয়ে ফ্ল্যাটেন উচ্চ-বাচ্য করলেন না ।

বেগিণাব সন্দেহ হ'ল, বোধ হয় ফ্ল্যাটেনের কাছে কোন কথাই অবিদিত নাই এবং তাঁর জ্ঞাতসারেই তাকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হ'য়েছে যাতে করে সে তার অন্তর্দাহ ক্রমশঃ ভুলে যেতে পারে । হয়ত ষড়যন্ত্র করেই তাঁরা তাব হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছেন দয়া করে, দাক্ষিণ্য করে, তাকে তরলমতি ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক মনে করে । তাবা চক্রান্ত করেছেন তার বিরুদ্ধে যাতে তাব স্তম্ভুত্থিত মাতৃবোধ টাকার লোভে চাপা পড়ে যায় । আর সে এতই হীন যে সত্যই সে তা' করেছে । সে সব কিছু ভুলে গিয়ে থাকে-দাচ্ছে ঘুমাচ্ছে । সে অবনত মস্তকে সব কিছু অপমান বরদাস্ত করেছে । না, তাঁদের চালে কোন ভুল হয়নি, কেননা সে সত্যিই হীনতম আচরণ করেছে এবং সকলের যথেষ্ট ব্যবহারের পোষকতা করেছে,—মাত্র কয়েকটা টাকার লোভে ।

পড়তে পড়তে ফ্যাটেন মাঝে-মাঝে রেগিণার যৌবন-দীপ্ত সৌন্দর্যের দিকে অপলক নেবে তাকিয়ে দেখছিলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি বই থেকে মুখ তুলে সহাস্তমুখে বললেন, “ফ্রকেন অ্যাজ, কি ভাবছ?”

রেগিণা চমকে উঠল, কিন্তু সে মুহূর্তের জ্ঞ। পর মুহূর্তেই অভ্যাসমত জোর কবে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, “কই কিছ না ত!”

আবার ফ্যাটেন বই-এ মন দিলেন, আর রেগিণা সেলাই-এ। আগুনের উত্তাপে রেগিণার হাত ছুটিকে রক্তিম দেখাচ্ছে। ফ্যাটেন আড়চোখে সেই সুন্দর হাত ছুটির দিকে মাঝে-মাঝে লুকিয়ে দেখছেন। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য হ’ল, বেগিণাব চম্পকদাম অঙ্গুলিতে কোন আঙ্গুটি নাই। আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ঠোঁটের ডগাই কত কথাই না গুঞ্জরিত হ’তে চাইল। কিন্তু তিনি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না।

রেগিণা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করলে স্ততরাং ফ্যাটেনও শুভরাত্রি জানাতে বাধ্য হ’লেন। বেগিণাব পদশব্দ ক্রমশঃ সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল। সেই অপস্রয়মান পদধ্বনিব দিকে কান বেখে ফ্যাটেন বলক্ষণ পর্যন্ত সেইখানে মুহমানের ছায় বসে রইলেন। আগুনের উত্তাপ যে ক্রমশঃ কমে আসছে সে দিকে তাঁব খেয়াল নেই। সময়মত কয়েক টুকরো কাঠও যে আগুনে ফেলে দেবেন, তাও ভুলে গেলেন।

বেগিণা নিজের ঘরে খাটের ওপর বসে আলোর দিকে চেয়ে

চেয়ে ভেবে চলেছে। ভাবছে তার সেই সনাতন চিন্তা—তাব ছেলেটি এখন কোথায়, কেমন আছে, এই সব। সে প্রতিজ্ঞা কবলে, যেমন কবেই হোক এ সংবাদটুকু তাকে বার কবতেই হবে। সে কেবল এইটুকু জানে যে তাব ছেলেটি এই পৃথিবীকোথাও না কোথাও বাজাব হালে প্রতিপালিত হচ্ছে। এব বেশী জানবার তাব সুযোগ হয়নি। সুতবাং পুত্রের অবস্থান সম্বন্ধে নানাকপ সম্ভাবনাব কথা তাব মনে উদ্ভিত হতে লাগল। যতই সে এ বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল, ততই তার মন অধীব হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে অধীব আগ্রহে একদিন সে প্রফেসরকে একখানা চিঠি লিখে ফেললে।

বহুদিন, বহুসপ্তাহ বেগিণা অপেক্ষা কবে কাটিয়ে দিলে কিন্তু অধ্যাপকের দিক থেকে পত্রের কোন জবাব এল না। সে বেগে গিয়ে ভাবলে, সকলেই আমার এই আগ্রহকে একটা নিছক খেয়াল বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। দোলানে চেয়ারের দোলানি থামিয়ে সে ভাবতে বসল, অবশেষে সে সত্যসত্যই পাগল না হয়ে যায়।

তাবপর থেকে বেগিণাব দিনগুলি অদ্ভুতভাবে কাটে লাগল। সে প্ল্যানের পর প্ল্যান কবে চলল, কিন্তু কার্যতঃ কিছুই কবতে পাবলে না। মানষিক ধৈর্য হারিয়ে সে হতাশাব সঙ্গে ভাবতে বসল, তার জীবনেব এই দুঃখ-নিশা কোন দিনই কি শেষ হবে না ?

এই মিথ্যার খাঁচা থেকে ছাড়া পাবার জন্তে সে আকুল-বিকুলি করতে লাগল। এমনি করে সময় বয়ে চলল এবং ক্রমে শীতকাল এসে গেল।

নয়

বড়দিনের পর একদিন বেগিণা বেড়াতে বেড়িয়ে দাক্ষ মাথাধরা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে এল। বিকেলের দিকে এল ভীষণ জ্বর। ছোট্ট মেয়েটির মত সে কাঁদতে শুরু করে দিল। সারা বুকে-পিঠে নিদাক্ষ ব্যথা নিয়ে সে সারাদিন নিঝুমের মত শুয়ে রইল। তার চোখের সামনে সব কিছু যেন ঝুলতে লাগল। চোখেব ওপর নেমে এল গাঢ় অন্ধকার।

ঘুম ভাঙতে রেগিণা দেখল, ঘরের ভেতর একটি মূহু বাতি জ্বলছে আর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর লিগুয়াম্। সেই তল্লাচ্ছন্ন অবস্থায় রেগিণাব মনে হ'ল যেন তার নিজের ছেলেটিই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার প্রথমে বেগিণাব শরীরের উত্তাপ দেখলেন তারপর তার বুক ও পিঠ পরীক্ষা করতে চাইলেন। রেগিণা ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। এইবার বুঝি সে ধরা পড়ে যায় যে সে এক সন্তানব জননী। তাড়াতাড়ি হু'হাতে সে তার নৈশ-পোষাকটি চেপে ধরল। ডাক্তার মূহু হেসে আস্তে ক'রে তার হাত দুটি সরিয়ে দিয়ে তার জামাটি খুলে ফেললেন। তারপর পরীক্ষা শেষ ক'রে তিনি তাকে গরম কাপড় ঢাকা দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে নির্দেশ দিলেন। যাবার সময় ক্ল্যাটেনকে বলে গেলেন যে মেয়েটির নিমুনিয়া হ'য়েছে। কথাটা রেগিণার কাণে গেল

কিন্তু সে জ্রুৎপণ্ড করল না। তার তখন একমাত্র চিন্তা—
ডাক্তার টের পেয়েছেন কি না।

সারারাত্রি ধরে মুখ ক্যাকাশে করে ফ্ল্যাটেন নীচের তলায়
উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালেন। তিনি মাঝে-মাঝে তাঁর স্ত্রীব
সজ্জিত তৈলচিত্রটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাকিয়ে
দেখতে সাহস পেলেন না, তাড়াতাড়ি অন্ধ ঘরে পালিয়ে গেলেন।
তারপর তিনি পা টিপে টিপে রোগিণীর কক্ষদ্বারে দাঁড়িয়ে কাণ
পেতে কি যেন শুনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে তাঁব
সাহস হ'ল না। তিনি পা টিপে টিপে আশাব যখন নীচে নেমে
গেলেন, বাইরের হিমেল বাতাস তখন গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে
সন্ সন্ কবে বইছে। সারারাত্রি ধরে হাতে বাতি নিয়ে তিনি
নিশাচরের মত এ-ঘব ও-ঘব ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

পরদিনও ফ্ল্যাটেন অফিসে গেলেন না। ডক্টর লিগ্জাম
যখন সকালে রুগী দেখে নীচে নেমে এলেন ফ্ল্যাটেন তখন
ভীত সঙ্কস্তভাবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে
দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তাব ভরসা দিলেন, বয়স কম ও স্বাস্থ্য ভাল
বলে মেয়েটি এ-যাত্রা বোধ হয় টাল সামলে উঠতে পারবে।

ছ'দিন ধরে বেশীর ভাগ সময়ই রেগিণা অচৈতন্যের ঘোরে
পড়ে রইল। ফ্ল্যাটেনেব আদেশে একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা
সব সময়েই তার শিয়রের কাছে বসে থাকত। সেই বৃদ্ধা
রেগিণার পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবত, মেয়েটা
শেষ পর্যন্ত মেরে উঠবে ত ?

একদিন রাত্রে রেগিণা হঠাৎ জেগে উঠে কেমন এক দৃষ্টিতে সেই বৃদ্ধাটির দিকে চেয়ে, অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে চৈঁচিয়ে উঠল, “আনা, এখুনি তোমাকে একটা চিঠি লিখতে হবে যে!”

“চিঠি ? মা-কে লিখবেন বুঝি ?”

বেগিণার হৃদপিণ্ডেব স্পন্দন গেল বেড়ে—কিন্তু সে পূর্বের মত স্থিরদৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললে, “মা ? মা ত অনেক দিন হ’ল মারা গেছেন। আমি আজ তোমাকে একটা গোপন কথা বলতে চাই, কিন্তু সাবধান—আব যেন কেউ সে কথা না জানতে পাবে। জান, আমার একটা.....”

এই পর্যন্ত বলেই তাৎ দম আটকে এল। সে পুনর্বার নিমজ্জমান ব্যক্তির ছায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চোখ বুজে শুয়ে বইল।

মধ্যরাতে বেগিণা হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠল, “ওকে আমার কোলে দাও, তোমাদেব পায়ে পড়ি, ওকে আমার কোলে ফিরিয়ে দাও।”

বৃদ্ধাটি তাকে সাস্থনা দিতে লাগল, “চুপ করুন, অত কাঁদবেন না—একটু স্থির হন।”

“দেখছেন ও কেমন তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কিছুতেই ফিবিযে দেবে না আমাকে ? আমি তাকে নিজের হাতে খুন করেছি—ওঃ আমি কি করেছি, আমি কি সর্বনাশ করেছি।”

দীর্ঘ একমাস ভূগে রেগিণা ধীরে ধীরে আবোগ্য লাভ করে বিছানায় উঠে বসল। ‘পূর্বের মতই ঘটা করে তাব সেবা-শুশ্রূষা

হ'তে লাগল। দামী দামী ওষুধে ও পথ্যে তার শয্যাপার্থ ভরে উঠল। বাড়ীশুদ্ধ লোক যেন তার অনুমাত্র আদেশের অপেক্ষায় তটস্থ হয়ে আছে। ফ্ল্যাটেন নিজে অন্তরালে থেকে স্নেহভাবে তার সমস্ত সেবার ভার পরিচালনা করতে লাগলেন। রেগিণার কাছেও সে কথা অজানা রইল না।

রেগিণা যেন নবজন্ম লাভ করেছে। ফ্ল্যাটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার সারা দেহ-মন ভরে উঠল। একদিন অ'য়নায় মুখ দেখে সে প্রথম উপলব্ধি করলে যে তার চেহারা অতাপ্ত খারাপ হয়ে গেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবল, এ ভালই হয়েছে, সৌন্দর্যে আর আমার কি কাজ ?

এখন থেকে তার ভবিষ্যতের সমস্ত চিন্তা ঐ ছোট্ট অন্তরালবর্তী শিশুটিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগল। সুষেব রশ্মি দেখে তার মনে হ'তে লাগল, ছেলেটি বুঝি তার অতাপ্ত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরের কোণে রক্ষিত লতাগাছের চাবাটি যেমন সর্বদা জানালার দিকে বেড়ে চলে, তেমনি রেগিণাব সমস্ত চিন্তাধারাই এখন হ'তে ঐ শিশুটির দিকে প্রসারিত হ'তে লাগল। মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসে রেগিণার কল্পনা করবার সাহসও যেন অসম্ভব বেড়ে গেছে। এখন সব কিছু অনুবোধই তার কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হ'তে লাগল। আত্মীয়-স্বজনের ভীতি, লোকেদের নিন্দা-সুখ্যাতি, বিবাহিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা—প্রভৃতি যে সব আবেগের মূলোৎপাটন করতে তাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হ'ত এতদিনে সে প্রয়োজন

ফুরিয়ে গেল। সেই সব আবেগ যেন আপনা হ'তেই ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল—সেই একটি মাত্র প্রোজ্জ্বল চিত্তাব একাগ্রতায়।

হাতে কোন কাজ নেই। কর্মহীন অবসাদে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেগিণী পুত্রের স্বপ্ন দেখছে। মনে মনে তাকে জামা-কাপড় পড়াচ্ছে আর ছাড়াচ্ছে। এমনি নিরুদ্দম অবসরে হাসপাতালে শুয়ে থাকার অলস দিনগুলির স্মৃতি স্পষ্টভাবে তার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল।

এমনি ভাবে ফেব্রুয়ারীর সুখবর রৌদ্রের দিনগুলি চলে গিয়ে বসন্তকালের সূচনা দেখা দিল। বেগিণাব মন এখন এক অকারণ আনন্দে সর্বদা ভরপূব। যেমন কেউ কোন একটি স্থিতি-সংকল্পের দিকে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাকিয়ে থাকে, তেমনি আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে বেগিণী বসন্তের সূর্যকিরণস্নাত আমেজি দিনগুলির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল।

বেগিণী প্রফেসরকে আবাব একখানা চিঠি লিখলে। সে মন স্থিতি করে ফেলেছে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সে আমেরিকায় চলে যাবে এবং লোকচক্রুর অন্তরালে সেখানে কাপড় কেচে, না হয় সেলাই করে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দেবে। মাতা-পুত্র উভয়ে যদি একত্র থাকতে পারে, তা'হলে কষ্ট বা লোকনিন্দা,—কিছুই সে গ্রাহ্য করবে না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু প্রথমবারের মতই অধ্যাপক নিরুত্তর রইলেন।

একদিন প্রাতঃরাশের টেবিলে রেগিণা ফ্ল্যাটেনের গুটেনবার্গ থেকে লেখা একখানা চিঠি পেল। একটা অস্বস্তিকর সম্ভাবনার কথা মনে পড়ায় চিঠিখানা খুলতে গিয়ে রেগিণার হাত কেঁপে গেল। পড়ে দেখলে, সে যা' ভয় করছিল ঠিক তাই ঘটেছে— ফ্ল্যাটেন বিবাহের প্রস্তাব করেছেন।

অনেকক্ষণ ধরে চিঠিখানির দিকে রেগিণা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। নারীর সহজাত মনোবৃত্তিতে সে খানিকক্ষণ আনন্দে বিহ্বল হয়ে বসে রইল। চিন্তা করলে, যদি এই প্রস্তাবে মত দেয় তা'হলে সমাজে সে এক মর্যাদাপূর্ণ আসন পাবে। লোক হিসেবে ফ্ল্যাটেন সত্যিই খুব চমৎকার! কিন্তু তাঁকে সব কথা খুলে বলা কি সম্ভব? না তাঁর সঙ্গে সারাজীবন সে প্রতারণাই করে যাবে? রেগিণা মাথা নেড়ে, মনে মনে উচ্চারণ করলে, এ অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব!

রেগিণা অনেক ভেবে দেখলে যে এই ঘটনার পর আর এ বাড়ীতে তার থাকা চলে না। কিন্তু কোথায় যাবে সে? এই মুহূর্তেই তাকে মনস্থির করতে হবে। কয়েক শ' ক্রোণার মাত্র তার হাতে জমেছে। আটলান্টিকের ওপারে পালিয়ে যেতে ঐ সম্বলটুকুই যথেষ্ট।

ফ্ল্যাটেন গুটেনবার্গ থেকে ফিরে এলেন। লজ্জায় ও উৎকণ্ঠায় তিনি রেগিণার মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারলেন না। তাঁরা উভয়ে খেতে বসে নীরবে আহার শেষ করে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলার ফ্ল্যাটেন তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে একা বসেছিলেন, হঠাৎ রেগিণাকে সেখানে আসতে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। স্নান হেসে তিনি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। রেগিণা কিন্তু বসল না। কিছুক্ষণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললে, “আমি নরওয়ে ফিরে যাব স্থির করেছি।”

ফ্ল্যাটেন চেয়ারে মুসড়ে বসে পড়লেন। হাতে মাথা রেখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি চিন্তিতমুখে বসে রইলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, “তুমি কি চিরদিনের মত চলে যাচ্ছ?”

“হ্যা, ঠিক করেছি সেখান থেকে আমেরিকায় চলে যাব।”

একটা কলম দিয়ে ব্লটিং-এর ওপর হিজ্জিবিজ্জি কাটতে কাটতে স্নান হেসে ফ্ল্যাটেন বললেন, “আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও? বেশ, আমি বাধা দেব না। আশা করি আমার ওপর রাগ করে যাচ্ছ না। আর একটি অনুরোধ! যদি কখনও প্রয়োজন বোধ কর, আমার কাছে সাহায্য চাইতে দ্বিধা বোধ ক’রো না। এই করুণাটুকুই তোমার কাছে চাই।”—এই কথা বলে হের্ ফ্ল্যাটেন গভীর স্নেহভরে রেগিণার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন।

রেগিণা মন স্থির করে ফেলেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সে চলে যেতে পারে, ততই মঙ্গল।

দশ

মার্চমাসে একদিন সকালবেলায় রেগিণা নরওয়েগামী ট্রেনে চেপে বসল। গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর পেরিয়ে পশ্চিমমুখো ট্রেন উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। রেগিণাব কিন্তু মনে হ'তে লাগল, খুব মন্থর গতিতে চলেছে ট্রেনটি। একবার তার মনে হ'ল এখনও ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে তার পুর্বনো জীবনে ফিরে যাবার সময় আছে। এ যাত্রার ফলাফল যখন অনিশ্চিত, ফিরে যাওয়াই কি সুবুদ্ধির কাজ নয় ?

রেগিণার মনে হচ্ছে, এতদিন যে তীরে সে তার অতীত জীবনের নৌকা ভিড়িয়েছিল, তা' থেকে সে যেন দূরে, বহুদূরে সরে যাচ্ছে! সব কিছু ত্যাগ করে যে নতুন তীর অভিমুখে এখন সে ছুটে চলেছে, সেখানেই বোধ হয় তার ক্ষুদ্র শিশুটি তার জ্ঞে অপেক্ষা করে বসে আছে!—কিন্তু যদি তার সন্ধান না পাওয়া যায় ? তা'হলে এই বিপদ-সঙ্কুল অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়া কি নিরর্থক হবে না ? কি লাভ হবে তাব ভবিষ্যৎ জীবনকে ছন্নছাড়া, ভবঘুরের মত ব্যর্থ হ'তে দিয়ে ? কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সমস্ত পথ কি সে নিজের হাতেই বন্ধ কবেনি ?

ক্রিষ্টিয়ানা স্টেশনে পৌঁছে রেগিণা মাল-পত্র ওয়েটিংরুমে জিম্মা করে দিয়েই সোজা হাসপাতালে ছুটে গেল। একটা উপযুক্ত বাসস্থানও যে পূর্বে খুঁজে রাখা দরকার, সে বিষয়েও

রেগিণা সম্পূর্ণ উদাসীন। হ'সপাতালে সহকারী ডাক্তারের সঙ্গেই প্রথম দেখা। তিনি জানালেন যে অধ্যাপক হঠাৎ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। রেগিণা তার কাছ থেকেই অধ্যাপকের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ডেকে তা'তে চড়ে বসল।

ড্রামেন রোড ধরে গাড়ী ছুটে চলেছে অধ্যাপকের সহরতলীব বাসভবনের দিকে। রেগিণার তখন অধৈর্য অবস্থা—কোন রকম দেবীই সহ্য হচ্ছে না। রাস্তায় ট্রামগাড়ী পারাপারের জেতে কোচম্যানকে মাঝে-মাঝে গাড়ী থামাতে হচ্ছিল বলে সে বেশ বিবিক্ত হয়ে উঠতে লাগল।...অবশেষে একটা বড় পাথুরে বাড়ীর তেতলায় পৌঁছে রেগিণা দরজার কড়া নাড়লে। একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিয়ে এ্যাক্সে হাত মুছতে মুছতে জানালে যে অধ্যাপকের বাড়ীবাড়ি রকম অসুখ!

বেগিণা তাকে অনুরোধ করে বলল, “আমি অধ্যাপকের সঙ্গে একটি বার মাত্র দেখা করতে চাই।”

পথশ্রান্ত রেগিণার ময়লা জামা-কাপড় ও উস্কো-থুস্কো চুল দেখে পরিচারিকাটির তাকে যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত বলে বোধ হল না। স্তবরাং সে দরজা বন্ধ করতে উদ্বৃত হ'ল। রেগিণা তাড়াতাড়ি তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে অমুনয়ের ভঙ্গীতে বললে, “আমার খুবই দরকার—অসুস্থ অধ্যাপকের জ্বীকে একটিবার ডেকে দাও।”

বৃদ্ধা ঝুঞ্জে উঠে বললে, “কি! জোর করে ঢুকবে নাকি? ভাল চাও তো পথ ছেড়ে দাও বলছি।”

“অনুগ্রহ কবে তোমাদের কর্তা ঠাকরুণকে একবার ডেকে দাও।”

অনেক করে পরিচাবিকাকে রাজী করালে রেগিণা। কিছুক্ষণ পরে একজন পুরু-কেশী বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে অশ্রু-বিন্দু কণ্ঠে বেগিণাকে তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

রেগিণা কাতরকণ্ঠে বললে, “এই বিপদের সময় আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি সত্যিই লজ্জিত। আপনাব স্বামীকে আমি কেবল একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে তাঁর উত্তরের ওপর।”

“আপনি কি করে কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে?—আমার পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলার হুকুম নেই। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি? কে আপনি?”

রেগিণা চোখে হাত চাপা দিয়ে বললে, “নাম বললে কি চিনতে পারবেন আমাকে? তাঁকে অনুগ্রহ ক’রে একবার জিজ্ঞাসা করুন, এক বৎসর পূর্বে হাসপাতালে এসে কারা আমার ছেলেটিকে দত্তক নিয়েছিলেন?”

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর এই প্রথম রেগিণা নিজের গোপন কলঙ্কেব কথা নিজমুখে উচ্চারণ করলে। বৃদ্ধা মহিলাটি একবার তার দিকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে ঈষৎ বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, “ডাক্তারের অনুমতি পেলেই আমি তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করব। কাল না হয় একবার আসবেন।”

রেগিণা অগত্যা ক্লান্তভাবে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি ! কিন্তু হঠাৎ তার মনে হ'ল আজ রাত্রেই যদি অধ্যাপক মারা যান ? রেগিণার মাথা ঘুরে গেল। কোন গতিকে সে নিজেকে সামলে নিলে।

রাস্তাঘাট শব্দময় ও জনাকীর্ণ। তবুও রেগিণার মনে হ'ল সে যেন এক জনহীন মরুপ্রান্তবের মধ্য দিয়ে হেটে চলেছে। এই চলমান জনসমুদ্রের সঙ্গে তার যেন কোন প্রাণসংযোগ নেই। এখন এ পৃথিবীতে কেবলমাত্র একজনের সঙ্গেই তার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান। তাকে খুঁজে বের করাই এখন তার একমাত্র কাজ। কিন্তু সন্ধান যদি না পায়, কি উপায় হবে তার ?

সে কাল-রাত্রি যেন আর কাটতে চায় না। পরদিন প্রত্যুষে আবার বেগিণা অধ্যাপকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হ'ল। পূর্বদৃষ্ট পরিচারিকাটি এসে নিয়মের জানালে যে অধ্যাপকের অবস্থা এখন-তখন। বহু অল্পনয়-বিনয়ের পর অধ্যাপকেব শ্রী বেরিয়ে এলেন এবং তাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন। ফিরে যাবাব উপক্রম করে বিরক্তস্বরে বললেন, “আবার কি আপনি জ্বালাতে এলেন ? দেখছেন না, আমাদের মাথার ওপব কতবড় বিপদ !”

রেগিণা কিছুক্ষণ প্রান্তরমূর্তির মত স্থির-গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ছুটে গিয়ে, মহিলাটির হাত ছুঁটি

জড়িয়ে ধবে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্যাব মত মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। মহিলাটি চমকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, মেয়েটি উন্মাদ নয় ত ?

বেগিণা চীৎকার করে বলে উঠল, “এক মিনিটের জন্তু আপনাকে আমার কথা শুনতেই হবে। এ পৃথিবীতে একমাত্র আপনার স্বামীই জানেন আমার ছেলেটি কোথায় আছে। ভগবানের দোহাই, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করুন। এরই জন্তু আমি সুইডেন থেকে ছুটে আসছি। স্বেচ্ছায় একদিন আমি আমার সন্তানকে পরিত্যাগ করেছিলাম বটে কিন্তু এখন আমি অনুশোচনায় জলে পুড়ে যাচ্ছি। আমি আমার ছেলেকে ফিবে পেতে চাই। অধ্যাপকের জীবন থাকতে থাকতে তাঁকে এই একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করুন। নইলে আমি পাগল হয়ে যাব, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করব। এই অভাগিনীকে দয়া করুন”—এই কথা বলতে বলতে বেগিণা বিহ্বলভাবে কাদতে লাগল।

ভদ্রমহিলা বেগিণাব এই উচ্ক্ষিত কান্নায় কিছুটা নরম হলেন। ঝুঁকে পড়ে তার গালে টোকা দিতে দিতে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, “অত উতলা হোয়োনা মা, যদি তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে, আমি তাঁকে নিশ্চয়ই এ’ কথা জিজ্ঞাসা করব। কাল বিকেলে একবার এসো।”

অবশেষে ভদ্রমহিলা স্বীকৃতা হয়েছেন। সেই উদ্বেজনায রেগিণার বুকে আবার নতুন বল এল। আবার তার মন

আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, কাল সে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ পাবে।

অনেকক্ষণ ধরে সে উদ্ভ্রাস্তের মত উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সহরের এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক একটি মিনিট যেন তার কাছে দীর্ঘ এক একটি যুগ বলে বোধ হচ্ছে। তার চারিদিক ঘিরে যেন এক জনহীন, শব্দহীন পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে আর সে তার ঠিক মধ্যোখানে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই নিস্তরূপ পৃথিবী তাকে হিমালীস্পর্শ দেবে, কি একটি আরামপ্রদ উত্তাপ-বিকীর্ণ গৃহকোণের সন্ধান দেবে, কালই তা' নির্ধারিত হবে। কাল,—মধ্যে আব একটি দিন মাত্র! অকস্মাৎ নিজের অজান্তে রেগিণা কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করতে বসল। এখন সে যেন চোখের সামনে উদ্দীপ্ত আলোর রেখাটিকে দেখতে পাচ্ছে। তার মনে হ'ল, এইবার সে রৌদ্রকিরণ-স্নাত পাহাড়ের চূড়ায় আবোহণ ক'রে সাক্ষাৎ ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে পেরেছে। তার সমস্ত অবিশ্বাস ও ছুশ্চিন্তার বে'ঝা যেন মন্তবলে চিরদিনের জন্ম কাঁধ থেকে খসে পড়ল।... অবশেষে গভীর রাতে রেগিণা হোটেলে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল। তার কেমন যেন স্থির বিশ্বাস হ'ল, ঈশ্বর তার কাতর প্রার্থনা স্বকর্ণে শুনেছেন।

পরের দিন সকাল ন'টায় রেগিণা কফি না খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। অধ্যাপকের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দেখল বাড়ীর সামনে

অনেকগুলি গাড়ী সারিবন্দী ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং অনেক লোক বাড়ীব সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছেন। এক অজানা আতঙ্কে তার প্রাণের ভেতরটা ছুঁক ছুঁক করে কেঁপে উঠল। সে বোকাব মত ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে, অধ্যাপক গৃহিনী একটা চেয়ারে বসে অঝোর-নয়নে কাঁদছেন আব জন কয়েক লোক খুঁকে পড়ে তাঁকে সাশ্বনা দেবার চেষ্টা কবছেন। অদূবে একটা খাটে অধ্যাপক স্থিবি হয়ে শুয়ে আছেন যেন! রেগিণা দ্রুতপদক্ষেপে বিছানার ধাবে গিয়ে অধ্যাপকের হাতখানি জড়িয়ে ধরল। দেখলে হাতখানা শক্ত ও বরফেব মত ঠাণ্ডা।

লোকগুলি রেগিণার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। রেগিণা সে দিকে দ্রক্ষেপ মান না কবে, বিবর্ণ মুখে অধ্যাপক-গৃহিনীর কাছে ছুটে গিয়ে কাতব, ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, “আমার কথা কি কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?...”

অধ্যাপক-গৃহিনী সজল চক্ষুটি তুলে, অপদস্তভাবে একবার তাব মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, আহত ব্যাত্মীর মত সে চোখ দুটি জ্বলছে। অনেক কষ্টে শক্তি সঞ্চয় কবে, মৃদুকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, “কিছুই জানা সম্ভব হয়নি, এমনকি, তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পর্যন্ত পেলাম না।”

সেই মুহূর্তে রেগিণার পায়ের নীচের মাটি যেন ছলে উঠল!

এগার

রাত্রি ষিপ্রহরের সময় পশ্চিম স্টেশনে কর্মরত একজন পুলিশম্যান লক্ষ্য করলে যে সমুদ্রের বেলাভূমিতে একটি অস্পষ্ট মূর্তি উদ্ভাস্তব মত উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুবে বেড়াচ্ছে। সেই মূর্তিটি কালো জলেব ওপব যে কয়েকটি আলোক-রেখা ছলছে, সেইদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আকৃতিটিকে দেখে জ্বীলোক বলেই বোধ হ'ল। বাত্রি বাবোটার সময় আলোগুলি নিবাপিত হবে, জ্বীলোকটি বোধ হয় তারই অপেক্ষা করছে।

ইঠাং মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল! পুলিশম্যানটি দ্রুত সমুদ্রের কিনাবায় গিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। দেখলে, মেয়েটি টেলিফোনের একটা খুঁটির নীচে পথের ওপব বসে পড়েছে।

মেয়েটির চলা-ফেরা কেমন যেন সন্দেহজনক বলে ধাবণা হ'ল পুলিশটিব,—তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কবা দবকাব এই ভেবে পুলিশটি মেয়েটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তার কোন অসুখ-বিসুখ করেছে কিনা!

মেয়েটি মুখ তুলে তাকাতেই গ্যাস-বাতির স্তিমিত আলো এসে তার মুখের ওপব পড়ল। ধীবে ধীবে সে উচ্চারণ কবলে, “অসুখ ?—কই, না ত !”

“তবে ? আপনি কি কারও জ্ঞাত্রে অপেক্ষা করছেন ?”

“কেন, আমার কি এখানে বসবার অধিকার নেই নাকি ? আমি ত কারও কোন অসুবিধা করছি না।”

“কোথায় থাকেন আপনি এখানে?”

“কি আশ্চর্য! একটু বসেছি এখানে, তা’তে এত কথাব দরকার কি? একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসবারও কি উপায় নেই?”

“তা’ থাকবে না কেন? তবে কিনা—অনেক রাত হয়েছে—তাই.....”

কয়েক পা অগ্রসর হয়ে পুলিশম্যানটি আবার থমকে দাঁড়াল। মেয়েটি ততক্ষণে তার উপস্থিতি বে-মালাম ভুলে গেছে। সে শাস্ত জলের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাগলেব মত চিন্তা করতে লাগল, না তোব মত স্ত্রীলোককে দয়া দেখানোও পাপ। যারা গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে তারাও বোধ হয় ক্ষমার যোগ্য; কিন্তু যে বমণী তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে নিজের সন্তান অজ্ঞাত লোককে বিলিয়ে দেয় সে ক্ষমারও যোগ্য নয়। তোর মত স্ত্রীলোকের একমা ৭ প্রায়শ্চিত্ত হলো ভূবে মরা...

পুনরায় উত্তেজিতভাবে মাতালের মত টলতে টলতে মেয়েটি অস্তির পদচারণা করতে লাগল। সহরে এখন ফিরে যাওয়া অসম্ভব, কেননা, সেখানে প্রতিটি প্রাণীর অঙ্গে লেগে বয়েছে তুষার-শীতল আর্দ্রতা। বাঁচবার আর কোন পথ খোলা নেই। মানুষের জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যখন জীবনকে অন্ধকারেব চেয়েও অনাকাঙ্ক্ষিত বোধ হয় আবার মরণও তখন যুগান্তের দূরে সরে দাঁড়ায়—স্পর্শ করতেও যুগা বোধ করে!

হঠাৎ পেছনে নাল দেওয়া ারী জুতোর খট্‌খটে আওয়াজ শুনে সে চমকে তাকিয়ে দেখলে সেই পুলিশটি আবার ফিবে এসেছে। জিজ্ঞাসা করছে, তাকে গাড়ী ডেকে দিতে হবে কিনা! কোন জবাব না পেয়ে সে চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানা গাড়ী এনে হাজির করলে। সমস্ত ঘটনা-গুলো যেন ভোজবাজীর মত মুহূর্তে ঘটে গেল। মেয়েটি অগত্যা হোটেলের ঠিকানা দিয়ে উঠে বসতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে।

চলন্ত গাড়ীতে যেতে যেতে হঠাৎ মেয়েটির একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করলে, ডক্টর ফোল্ডন্! ডক্টর ফোল্ডন্!! এই সহবেই ডক্টর ফোল্ডন্ বাস করবেন এবং তিনিই তাব এই সব ছুখ-কষ্টের মল। হয়ত তিনিই ছেলেটিকে লুকিয়ে রেখেছেন, অন্ততঃ জানেন কোথায় ছেলেটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বোধ হয় তিনিই নিজের সম্মানকে দাবিদার-নিপীড়িত বিড়ম্বনাময় জীবনযাত্রা থেকে রক্ষা করতে গোপনে তাব ভাব গ্রহণ করেছেন। ছেলেটির মায়ের ভাবও তিনি নিতে চেয়েছিলেন তাই একটি আরামপ্রদ স্ত্রীশ্রায়েব সন্ধান দিয়েছিলেন তাকে। কোন লোককে যত খাবাপ ভাবা যায় প্রকৃতপক্ষে সে হয়ত তত খারাপ নয়।

ছুলে ছুলে গাড়ী চলেছে; রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে চাকা থেকে একটা ঘর্ষর শব্দ উঠছে। এখন গাড়ী চলেছে কাল জোয়ান ষ্ট্রীট অতিক্রম হবে। আধো-অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা-ঘাট প্রায়

নির্জন। হঠাৎ মেয়েটি চীৎকার করে উঠল, “কোচ-ম্যান, তুমি ডক্টর ফোল্ডনের বাড়ী চেন কি?”

গাড়ীর গতিবেগ থামিয়ে কোচ-ম্যান ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েটি কিছু বলছে কিনা! তারপর সে নেমে এল। পকেট থেকে একটা নোট-বুক বার করে, রাস্তার মুহূর্তে আলোতে খানিকক্ষণ ধরে উণ্টে-পাণ্টে সেখানা দেখে নিলে। হ্যাঁ, এইত পাওয়া গেছে ডক্টর ফোল্ডনের ঠিকানা! সেই ঠিকানায় কি গাড়ী নিয়ে যেতে হবে?—কিছুক্ষণের মধ্যেই ইউনিভার্সিটি রোড পেরিয়ে গাড়ী নির্ধারিত ঠিকানায় এসে উপস্থিত হ’ল। রেগিণা ভাড়া চুকিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে।

এই ত গৃহদ্বারে ডক্টর ফোল্ডনের নামাঙ্কিত ফলক ঝুলছে! বিশেষ কিছু না ভেবেই রেগিণা দরজা-সংলগ্ন ঘণ্টাটা ধরে নাড়া দিলে। বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন সাড়া-শব্দ নেই। নিকটেই একটা ঘড়িতে একটাব ঘণ্টা পড়ল। থেকে থেকে হুঁ একটা গাড়ীব ঘর্ষ-শব্দ ভেসে আসতে লাগল। রাস্তাব জীবনস্পন্দন প্রায় থেমে এসেছে। রেগিণা সিঁড়িতে বসে পড়ল। তার চিন্তাশক্তি যেন ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। মানুষের যতখানি সহনশীলতার ক্ষমতা, সে তার শেষ সীমা লঙ্ঘন করেছে। সমস্ত সম্মান ও অভিমান বিসর্জন দিয়ে সে সেই লোকটির কাছেই ছুটে এসেছে, যে তাব সমস্ত জীবন-যৌবনকে ব্যর্থ ও পঙ্গু করে দিয়েছে। এত ঘটনার পরও কি সম্মান ও মর্যাদার কোন মূল্য আছে তার কাছে?

সে অপেক্ষা করছে ত করছেই। বেশ কিছুক্ষণ পর দোতলার একটা জানালা খুলে গেল। কে একজন সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি তার প্রয়োজন! বেগিণী জানালে যে সে ডক্টর ফোল্ডনেব সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

জানালা বন্ধ হয়ে গেল এবং কয়েক সেকেন্ড পরেই একজন পরিচারিকা নেমে এসে সদর দরজা খুলে দিলে এবং তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সিঁড়িতে উঠে বেগিণীর পা যেন অব চলে না। তার বুক ধবধব করতে লাগল। চমকে উঠে ভাবলে, হিঃ, এ কি করেছে আমি? মান্ন বাতে আমাকে এমনি অবস্থায় দেখলে না জানি কি ভাববেন তিনি। হয়ত বন্ধ পাগল বলেই ধারণা হবে বসে।

পরিচারিকা তাকে বদলান ঘবে বসিয়ে ডাক্তারকে খবর দিতে চলে গেল। বেগিণীও নিশ্চিন্তে মত একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

অন্যশেষে ভাবী পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ডক্টর ফোল্ডন ঘবে প্রবেশ করলেন। বিশেষ কিছুই পবিবর্তন হয়নি তার, কেবল সফ গৌপের সঙ্গে ছুঁচলো দাড়ি রেখেছেন খুতুনিতে। তাড়াতাড়িতে তিনি সার্টের ওপর একটা সিক্কেব টাই পড়ে নিয়েছেন। তিনি ঘবে ঢুকে ‘শুভস্বাস্থ্য’ জানিয়ে বললেন, “চলুন, আমি প্রস্তুত,—রোগীর অবস্থা কি খুবই খারাপ?”

রেগিণা দাঁড়িয়ে উঠে কোন রকমে ‘সুভসন্ধ্যা’ উচ্চারণ করলে। ফোল্ডনের হঠাৎ মনে হ’ল, বক্তাব কণ্ঠস্বরটি যেন খুবই পরিচিত। তিনি আবও কাছে এগিয়ে এসে তাকে দেখেই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বেগিণাও যেন সম্বিত হাবিয়ে ফেলেছে। এ সময় কি বলা উচিত, না উচিত, তাব যেন কিছু মাথায় আসছে না। তাঁরা উভয়ে নির্বাক বিশ্বয়ে পবম্পবের দিকে তাকিয়ে চিত্রাৰ্পিতের মত দাঁড়িয়ে বইলেন।

অনেকক্ষণ পর ডক্টর ফোল্ডন আম্‌তা আম্‌তা কবে কি যেন বলবার চেষ্টা কবলেন। বেগিণা তাব অপদস্ত ভাব দেখে উল্লসিত হয়েছে। তাব মনে হল, ডক্টর ফোল্ডন যেন ভূত দেখার মত ঘাবড়ে গেছেন। তার ভারী ইচ্ছে হ’ল, একবার উচ্চকণ্ঠেব ‘দম্‌কা’ হাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু কণ্ঠে সে-ইচ্ছা দমন কবে স্থির দৃষ্টিতে তাব চোখেব দিকে তাকিয়ে বললে, “মাপ করবেন, আপনাকে অধিক রাগেব বিবক্ত কবলাম। আমাব ছেলেটি কোথায়, সেই কথাই জানতে এসেছি। তাল ফিবে না পেলে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, আমাব কি অবস্থা হবে।”

ডক্টর ফোল্ডন জানালাব কাছে সবে গিয়েছিলেন, এইবার তিনি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কবে দিয়ে পর্দাটা টেনে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ রেগিণাব মুখেব দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেবে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, “বল কি! তোমাব ছেলে? তোমাব কি বিয়ে হয়ে গেছে?”

বেগিণা হঠাৎ উদ্ভাসিত মত অসংলগ্ন অট্টহাসি হেসে উঠল। সেই গলা-ফাটানো অট্টহাসি নিঃসঙ্গ বাঙালি বন্ধু বন্ধু অস্বাভাবিক প্রতিধ্বনি তুললে। মন্তব্যমূলক মত উদ্ভব ফোন্ডন তার দিকে এগিয়ে এসে প্রশংসার মত বলতে শুরু করলেন, “আন্তে, বেগিণা! আন্তে, লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমি... তোমার ছেলে... আমি যে কিছুই বুঝতে পারিনি—সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে!” এই কথা বলতে বলতে তাঁর হঠাৎ একটা সাংঘাতিক সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল।

“শুভবাসি, উদ্ভব ফোন্ডন, এখন বুঝি আমাবই ভুল হয়েছ,” এই কথা বলে বেগিণা দরজার দিকে পা বাড়াল।

উদ্ভব ফোন্ডন তার পথরোধ করে দাঁড়ালেন। আবেগভরে বললেন, “এ সব কথাই মানে কি? তে মার্ক অ্যান্ড শুকনো দেবাচ্ছে বেগিণা। তুমি কত বদলে গেছ। তুমি কি স্থান নও? তোমার কোন খবরই আমি জানি না। তোমার কোন উপকারেই কি আমি আসতে পারি না?”

নিঃশব্দে তার কবল-মুণ্ডে বসে বেগিণা ধীর অকম্পিত স্বরে উত্তর দিলে, “না, আমি মোটেই অন্তর্ধীন নই। সাহায্যের প্রয়োজন নেই আমাব — ধন্যবাদ।”

এই কথা বলে বেগিণা নির্ভীক অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারো

হোটেলের একটি ছোট কামবায় বেগিণা শুয়ে আছে। ঘবেব ভেতবে জমাট অন্ধকাৰ, কিন্তু বাইবেব গ্যাসবাতিব এক টুকুৰো আলো এসে ঘবেব মধ্যে জ্বমড়ি খেয়ে পবেছে। জামাকাপড না ছেড়েই বেগিণা বিছানায় শুয়ে পবেছে। হাতেব ওপৰ মাথা রেখে অৰ্ধনিম্নলিত নেত্র বেগিণা শুয়ে শুয়ে বাজ্যেব ভাবনা ভেবে চলেছে।

জীবনে এমন দুঃখ আছে যা হয় চোখেব জলে গলে গিয়ে মনকে হালকা কবে দেয়, না হয় মানুষকে বোবা কবে দেয়। আবাব এমনও দুঃখ আছে যা মানুষকে এক ভাসমান বৰফখণ্ডেব ওপৰ ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মানুষ তখন মাটিব স্পৰ্শ পাবাবে জন্তো ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এমন দুঃখে মানুস কাতব হয় না, দীৰ্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না, এমন কি চোখেব জল পৰ্যন্ত ফেলতে ভুলে যায়। প্রথমে মনে হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন অসাব হয়ে গেছে কিন্তু কিছুক্ষণেব মধ্যেই চিন্তাশক্তি ফিরে আসে। তখন সে নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে এক চাঁট বৰফ খসিয়ে ফেলে তাবই সাহায্যে দাঁডের মত জল কাটতে চেষ্টা কবে। স্মৃত্তপূৰ্ব পৰ্যন্ত যে নিজেকে অক্ষম ও হতভাগ্য বলে আক্ষেপ কৰছিল, ইয়াং সে যেন অস্ববণীৰ্ঘ ধারণ কবে। শুধু বাঁচবাব জন্তোই আকুলি-বিকুলি নয়, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কিছু সম্পাদন কৰবার জন্তোই যেন সে বদ্ধপৰিকব।

কয়েক ঘণ্টা চুপ করে পড়ে থেকে রেগিণা উঠে বসল। নিজেকে থিক্কার দিয়ে বললে, লজ্জা করেনা তোমার চোখের জল ফেলাতে? আবার এক ঝলক তিক্ত হাসি হেসে পুনরায় সে হাতের ওপব মাথা বেখে শুয়ে পড়ল।

এতদিন সে যেন একটি অর্ধ উন্মুক্ত দবজার সামনে ঠাই দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে ঊঁকি দিয়ে ছেনেকে সে একটু-আধটু দেখতে পাচ্ছিল। এতদিনে সই দবজাটা চিবদিনের জন্তু মুখের ওপব সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল এবং তাকে গভীর অন্ধকাবে মধ্য নিষ্কপ করলে। সে যে দিকেই তাকাতে চায় সেইদিকেই দেখে চোখের সামনে গাঢ়, ডমাট অন্ধকার। হয়ত তাব তেনেটি এই সহবেই আছে, কিস্বা এই দেশে কিস্বা অগ্র সহবে, কিস্বা উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ যে কোন একটা দিকের সহবে বা দেশে। পৃথিবীর কোন না কোন অংশে সে নিশ্চয়ই আছে অথচ আব তাব সন্ধান পাওয়া যাবে না। প্রফেসরের নৃত্যব সঙ্গে সঙ্গে তাব সে আশা চণ হয়ে গিয়েছে। এখন তাকে এ বিষয়ে বিন্দু-বিস্বর্গ সন্ধানও কেউ দিতে পারবে না। হাসপাতালে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করতেও সে কসুর কবেনি কিন্তু কোন ফল হয়নি। এমনকি ফোল্ডনের মত অমানুষের কাছে যেতেও সে পেছপা হয়নি, কিন্তু সবই বৃথা হয়েছে।

রেগিণা মনে মনে উচ্চারণ করলে, আর কেন আশাব স্বপ্ন দেখ? তোমাব বিরুদ্ধে এক ঘোরতর চক্রান্ত গড়ে তোলা

হয়েছে। মানুষ ত ছার, স্বর্গের দেবতার। পর্যন্ত সেই চক্রান্তে যোগ দিয়েছেন। ভগবানের দয়া থাকলে কি আর তোমার মত একজন অসহায় জ্বালোককে বিপদের পর বিপদ পাঠিয়ে বাব বার পর্যুদন্ত কবতে চাইতেন তিনি? অত্যাচারী সোকেস হাতেই ক্ষমতা থাকে আব সেই লোক নির্দোষীকে বিভ্রান্ত কববার জ্ঞে সবদাই সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে থাকে। তোমাকে অত্যাচারীর যুপকার্ঠে বলি হতে হবে—তা ছাড়া গত্যন্তর নাট। কিন্তু এইভাবে কতকাল আব ডর্ভাগোর বিকদ্ধে অহোবাব লড়াই কবে মরবে?

বেগিণাব মনে হল সেই মুহূর্তে তার ধমনীতে প্রবহমান বক্তশ্রোত যেন জমাট বেঁধে গেছে। অস্থির হয়ে সে উঠে বসল। জানালাব দিকে চাইতেই এক ঝলক বাস্তাব 'অ'লো এসে মুখেব ওপব পড়ল।

কাঁপতে কাঁপতে বেগিণা মনে মনে বললে, 'আজ থেকে আর কান্না নয়, প্রার্থনাও নয়—কারণ এতদিন সবকিছু আমাকে উপহাসই করে এসেছে। আর ঈশ্বর? ঈশ্বর ঐয়ত আমাকে চরম শাস্তি দিতে পাবেন, আমাকে নবকে নিষ্কেপ করতে পারেন এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পাবেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি জোর গলায় বলব তিনি আমাকে অগ্রায় করে এক নিরস, বিষাদময় জীবনের অধিকারীনি করেছেন। হয়ত ভবিষ্যতের জ্ঞে আরও দুর্বিসহ যাতনা ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। এখন থেকে আশা, বিশ্বাস ও ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিলাম। যে

উপায়েই হোক, যেমন কবেই হোক, হেলেকে আমি খুঁজে
বাব কববই কবব, কবব। যাবা আমাব প্রতি চৰ্য্যবহাব
কবেছে, তাদেব ওপবে আমি প্রতিশোধ নোব।'

এই প্ৰতিজ্ঞা কবাব পব তার মন অনেবখানি শাস্ত্ৰ হল।
মনে পড়ল বহুদিন তাব ভাগ্যে শাহাব ও খুম ডে'টেনি। তাব
বাগে কতকগুলি স্মাণ্ডউট্‌১০ ছিল। স্মাইডেন গে'বে আন।
সেই সব খাবাবগুলব কথা মনেও প'র্নি একবাব। সেগুলি
বাব কবে দেখলে কটিগুলি শ্রাববে বাহ হয়ে গেছে। সেই
শুনো কটিব দলা কোনও বামে গিলে সে এক খাম জল খেয়ে
শুয়ে পড়ল। মনে মনে বলণে, পুখা চিন্তা আব চোখেব জল
অনেক হয়েচে, অ' নয়। এইবাব কটুক্ষণ ঘুমোবব দব'াব—
নইলে আমি ঠিক পা'গল হয়ে যাব।

যখন সাতা সাত্ৰিষ্ঠ সে ঘুমিয়ে পড়ল তখন বাত চাবটে।

বেগিণাব যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা এগা বে'গা বেজ
গিয়েচ এবং ঘে'ব ভেতব কথা নোদ চুকে পড়য়ে। তখনও
তাব ঘুমেব আনেক সম্পূর্ণ কাটেনি। স্তববং পাণ বিবে সে
আবাব ঘুমিয়ে পড়ল। আবও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পবে উঠে,
খানিকটা কফি খেয়ে নিয়ে বিহানায় হেলান দিয়ে সে পুনবায়
চিন্তাসমুদ্রে ডুবে গেল। এইবাব তাব কোন একটা কিছু স্থিৰ
সিদ্ধান্তে আসাব প্রয়োজন হয়েচে। সে অনুভব কবলে যে এই
পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা এবং কারও মতামতব সে তোয়াক্কা

বাথে না। এখন সে বোকার মত যা খুসী তাই করতে পারে, বাধা দেবাব কেউ নেই।

এখন তার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন স্থির মস্তিষ্কে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। আর কোন ভুল-ভ্রান্তি নয়। সে যেন অচেনা যন্ত্রকার পথে হাতবে হাতরে চলেছে, হোঁচট খেলে আর রক্ষা নেই—অবধাবিত মৃত্যু। দূবে, অতি দূবে সে একটা আলোর ক্ষণ রেখা দেখতে পাচ্ছে, সেইদিকপানে সে এগিয়ে যেতে চায়। হয়ত সময় লাগবে, হয়ত আঁকা-বাঁকা পথে চলতে হবে, হয়ত কতশা আগাবে এবং ভুল হবে, তবুও গন্তব্যস্থানে তাকে পৌঁছতেই হবে। লক্ষ্যে পৌঁছবাব অনেকগুলি পথ আছে—যথা ভিক্ষা করা, লোক ঠকান, আরও কত কি। কিন্তু যে পথেই চানুক না কেন সবক্ষেত্রেই প্রধান প্রয়োজন যে বস্তুটির—তাব নাম টাকা। আর সেই বস্তুটিরই তাব একান্ত অভাব। মাত্র ছ' একশ ক্রোনার পুঁজি! কিন্তু সে আর ক'দিন? লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তাকে দিনেব পর দিন দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে এবং তাতে শ্রুত্ব অর্থের প্রয়োজন। তাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে। কোন একটা সন্ধানের ভায়া পেলে মাসের পব মাস ছুটে বেড়াতে হবে তার পেছনে। সামান্য যা সঞ্চয় আছে তাব ওপব নির্ভব করে থাকলে শীগ্রি তাকে কপর্দকহীন হয়ে, পুনবায় নুতন অবমাননায় আকর্ষ নিমজ্জিত থেকে দিন অতিবাহিত কবতে হবে। না, তা' সে কোন মতেই পারবে না।

বেগিণা মনে মনে তোলপাৎ করে ভাবতে লাগল কি উপায়ে প্রচুব অর্থ হস্তগত করা যায়। হঠাৎ তাব হেব ক্যাটেনেব কথা মনে পড়ে গেল। সে উৎসাহে ভাবলে, ওই একটা উপায় বটে।

প্রায় এক খণ্টা ধরে বেগিণা অস্থিরভাবে বিচিনায়ে এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে এগাত্তর কখন উপায় আছে কি না চিন্তা করিতে লাগল। কিন্তু কোন উপায় তাব মাথাব এল না। এক সময়ে দুঃখ মৰা। কিন্তু সে তত পুরুষের মনোবৃত্তি, জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈন্যের মনোবৃত্তি। বেগিণাব সেটা ঠিক পছন্দ হইল না। সেট দৃশ্যমান শাপ আলোক-কোথাটি বোধ হয় আলোই নয়, আলোক-শাস্তি মাত্র। কিন্তু সেহাঙ্গিৎ অনন্যমনে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাবিয়ে শবে তাকেই এক পে জ্বল আলোকশিখা বলে বেগিণাব ধবনা হ'ল।

বেগিণা মন স্থির করে ফেলল। তাডাত ডি ট্রা, জামাকাপড় বদলে স স্যাচেনকে টিঠি এখতে বসল। লিখলে, তাকে ডেড সেসে সে ভুল করে। তাব অতীত সন্দেহ ব্যবহাৰ ও দযাব কথা স্মরণ করে স স স স স ফলে যত চায়। তিনি যেন দযা ব স স্তান দেন।

হঠাৎ সে চমকে কলন থামবে ভাবল, এ আমি কি করছি ? এ ছাড়া সত্যিই কি আর উপায়সত্ত্ব নেই ? তাব অবচেতন মন থেকে কে যেন ঠাট্টা করে বলে উঠল, আছে বইক। বাকী আছে সমুদ্রে ডুবে মৰা।

আবার রেগিণা লিখতে শুরু করলে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আবার আপনা থেকেই কলম থেমে গেল। সে ভাবলে, সে ভর্জলোক ত আবার কোন অপকার করেন নি, সুতরাং তাঁকে এ ভাবে ব্যবহার করা কি উচিত হবে? কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবলে, আমিই বা কার কি অপকার কবেছি যে সবাই মিলে আমাকে তাদেব ইচ্ছেমত কাজে লাগাতে চায়! প্রথমে ফোল্ডন! নিজের গ্রীষ্মাবকাশকে মধুর করবার জন্তে সে আমাকে কাজে লাগালে। সে কি জানত না যে তার ব্যবহারে একটি কোমল নারী-হৃদয় চিবিদিনের জন্ত ভেঙ্গে যাবে? জেনে-শুনে সে আমাকে কাজে লাগালে। আর ভগবানের এমনই লীলা যে আজ সেই কিনা পবন নির্ভরশীল, পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করছে।...তারপর হাসপাতাল! সেখানকার প্রতিটি নোক আমাকে যদেচ্ছ নেড়ে-চড়ে তাদেব শিক্ষার কাজে লাগালে। আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি সেদিকে তারা ক্রক্ষেপও করলে না।...এমন কি ভগবান পর্যন্ত আমাকে তাঁব কাজে লাগাতে কসুর করলেন না। কত কাঁদলাম, কত প্রার্থনা করলাম, কিন্তু তিনি এই অভাগীনি নারীর আর্ত ক্রন্দনে কর্ণপাত মাত্র করলেন না। অপুত্রক কোন এক দম্পতীর একটি ছেলের দরকার, তাঁরা আমার ছেলেটিকে কেড়ে নিয়ে তাঁদের কাজে লাগালেন। আমার হৃদয় ভাঙবে তাতে তাঁদের কি? রেগিণা যে স্বেচ্ছায় ছেলেটিকে দত্তক দিয়েছে এ কথা বেমালুম ভুলেই গেল।

ক্রোধের আবেগে রেগিণা স্তম্ভ পাঁয়চারি করতে লাগল। সে প্রমাণ করতে চায় যে সে স্বেচ্ছায় ছেলেকে বিলিয়ে দেয়নি। সে ভাবলে, মানুষের দুর্ভাগ্যে অসুস্থবালে থেকে সুযোগেব প্রতীক্ষা করে। যখন প্রতিপক্ষকে সে দুর্বল ও অসহায় বুঝতে পাবে তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হৃদয়েব ধন কেড়ে নেয়। তারপর যখন সে সেটি ফিরে পেতে ব্যাকুল হয় তখন সুদখোর মহাজনের মত তমসুকথানা বার কবে দিয়ে আইন ও সত্বেব কথা তুলে ভুমকি দিয়ে বলে, 'এই খংখানা কি তুমি নিজের হাতে লিখে দাওনি ? '

অবশেষে অনেক অসুদ্বন্দ্বের পর বেগিণা যখন চিঠিখানা লিখে শেষ করলে তখন তার মনের উন্মাদ অনেক কমে এসেছে। সে অসুভব করলে, এইবার সে সেই শীর্ণ আলোক বেখাটির দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন তাব পক্ষে কোন অবস্থাতেই ফিরে দাঁড়ান অসম্ভব।

তেরো

হেব ফ্ল্যাটেনের গৃহে আজ এক বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছে। আহাৰাদিব পর নিমন্ত্ৰিতেরা যে যাব বাড়ী চলে গেলেন। চলমান গাড়ীগুলির স্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি দূর হ শীতের বাত্রে সেই নিঃস্বল্প উপত্যকাভূমিকে কিছুক্ষণেব জগ্ন মুখরিত কবে রাখলো। অবশেষে গাড়ীব আলোগুলি ক্রমশঃ গভীব অন্ধকাৰে বিলীন হয়ে গেল।

উচু উচু পাঠন গাছে ঘেবা সেই বহৎ অটালিকাৰ উভয় তলার জানালায় জানালায় কিছুক্ষণেব জগ্ন ভ্রাম্যমান আলোক-বর্তিকাগুলি চলাফেবা করতে লাগল। সেগুলিও ক্রমশঃ নিভে গেল। সারা বাড়ীটিতে তখন একটি মাত্র জানালা আলোকিত হয়ে রইল। বাকী সমস্ত বাড়ীটা গাঢ় অন্ধকাৰে ডুবে গেল।

হেব ফ্ল্যাটেন গোটা বাড়ীটা একবাব তদারক কবে শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন। সারা সন্ধ্যাব্যাপী নৃত্য ও মদিবার আবেশে তিনি বেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঘবেব ভেতর এসে তিনি একবাব বেগিণার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বেগিণা সাদা নৈশগজ্জা পবে সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট টানাছিল। বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। চোখছটি যেন এক বিশেষ ভাবাবেশে চক্চক্ কবছে। সেই মুহূৰ্ত্তে ফ্ল্যাটেনের মনে হ'ল বেগিণা পবমা স্তন্দরীই বটে। গাঢ়স্বরে ফ্ল্যাটেন বললেন, “আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানটি বেশ নির্বিঘ্নেই চুকে গেল, কি বল?”

সিগারেটে একটা টান দিয়ে রেগিণা উত্তর দিলে,
“নিমন্ত্রিতরা লোক সবাই নেহাৎ মন্দ নয়।”

ফ্যাটেন ড্রেসিং গাউন ছেড়ে খাটের কিনারায় বসে পড়ে এক
বিশেষ ধরণে চাইলেন রেগিণার দিকে। রেগিণা সে দৃষ্টি লক্ষ্য
না করবার ভাণ করে ধূমপান করেই চলল।

একটু শ্লান হাসি হেসে ফ্যাটেন খোসামুন্দির সুরে বললেন,
“তুমি যে অত সুন্দর নাচতে পার তা’ ত কোন দিন বলনি
আমাকে।”

“নাচ কিন্তু আমি তেমন করে কোন দিনই শিখিনি।”

শিশুর মত সরল হাস্য সমস্ত মুখখানা খুসীর উচ্ছ্বাসে
ভরে তুলে ফ্যাটেন বললেন, “ওঁ’বা সবাই তোমার উচ্ছ্বাসিত
প্রশংসা করছিলেন, বিশেষ কবে তোমার পোষাকটা ওঁদেব
খুবই ভাল লেগেছে।”

“কিন্তু মহিলারা যা বলাবলি করছিলেন তা ত শোন নি।”

হৃচ্চিন্তায় ভুরু কুঁচকে ফ্যাটেন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কবলেন,
“কি বলছিলেন তাঁরা?”

“তা’ তোমার স্তনে কাজ নেই। সেই সব ছুঁখ মন্তব্য
আমার কিন্তু চিরদিন মনে থাকবে।”

ফ্যাটেন বিছানার ওপর ঊঠে বসে জামা ছেড়ে বললেন,
“তুমি কি শোবে না এখন?”

বাঁইরে তখন ক্রুদ্ধ বাতাস শন শন কবে বইছে আর তুষাবের
পাপরিগুলি জানালার কাঁচের ওপর আছড়ে পড়তে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণের জন্তে ঘরটির ওপর এক অখণ্ড নিঃস্রবতা নেমে এল। রেগিণা ফ্ল্যাটেনের দিকে তাকিয়ে বললে, “তুমি কথা দাও, আজ যারা আমাকে অপমান করেছে তাদের তুমি দস্তুরমত শিক্ষা দেবে?”

মৃদু ভংসনার সুরে ফ্ল্যাটেন উত্তর দিলেন, “কেন বলত! এ কথা বলছ কেন? এত রাত্রে এ প্রশ্নের মীমাংসা কি না করলেই নয়?”

রেগিণা কিছুক্ষণের জন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্ল্যাটেন শাস্ত হবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দেখে মনে হ’ল তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। রেগিণা বৃদ্ধের এই চঞ্চল্যের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মনে মনে না হেসে পারল না। ভাবলে, আজ না হ’ক একদিন না একদিন ওঁর কাছে ধরা দিতেই হবে—বেশীদিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

পাঁচমাস হ’ল তাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু এই পাঁচমাসে এখনও তারা যথেষ্ট অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারল না। ফ্ল্যাটেন যতই কাছে এগিয়ে আসতে চান, বেগিণা ততই পিছলে পিছলে নাগালের বাইরে চলে যায়। ছ’মাসের জন্তে তারা গিয়েছিল মধুচন্দ্র যাপন করতে। তখন রেগিণা ভাবলে, আগে তো বাড়ী ফিরে যাই, তারপর দেখা যাবে। যখন সত্যিই বাড়ী ফিরে এল তখন ভাবলে, আরও কিছুদিন যাক্, আগে বাড়ী-ঘর-দোর একটু সামলে নি। অবশ্য সে স্বীকার করতে বাধ্য

হ'ল যে ফ্ল্যাটেন তার সঙ্গে খব মধুব ও অমায়িক ব্যবহার করছেন। ঠাণ্ডা থেকে আগুনের উত্তাপে এলে যেমন আরাম বোধ হয় ফ্ল্যাটেনের সাহচর্যও তেমনি দিন দিন কাম্যতর বোধ হতে লাগল। রেগিণা ভাবলে, এতদিনে সে এমন একটি লোকের সাহচর্য পেয়েছে যিনি তাকে সত্যিই কামনা করেন। এ তাব কাছে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি। ক্রমশঃ রেগিণার প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে এল। ফ্ল্যাটেনকে স্থখী দেখবার জন্মে সে তার সমস্ত দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করলে। এতদিন সে যে নানা অছিলায় ফ্ল্যাটেনকে দূরে ঠেলে রেখেছে এ কথা স্মরণ করে সে নিজেকে শত ধিক্কার দিতে লাগল। কিন্তু তবুও সে ফ্ল্যাটেনকে দূরেই সরিয়ে রাখলে। এই নিষ্ঠুর খেলায় সে আমোদ অনুভব করতে লাগল। সে ভেবে দেখলে আর বেশী দিন নয়,—বহু বিহঙ্গমীর ধরা দেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে!

একদিন ফ্ল্যাটেন বিরক্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার ব্যাপার কি বলত! চিরদিনই কি তুমি এমনি দূবে দূরেই থাকবে?”

রেগিণা ভাবলে, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! কিন্তু তবুও সে সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে খুবই নির্লিপ্ত থাকবার ভাণ করে বললে, “একটি কথা তুমি কিন্তু আমাকে আজও পর্যন্ত বলনি।”

ঘুমের আবেশে জড়িত কণ্ঠে ফ্ল্যাটেন জিজ্ঞাসা করলেন,
“কি কথা শ্রিয়তমে?”

“কি ভাবে তুমি আমার প্রথম খোঁজ পেলে?” এই কথা
জিজ্ঞাসা করেই বেগিণী ক্রমাগত ধূমপান করতে লাগল। সে
যেন সাংঘাতিক কিছু একটা উত্তর প্রত্যাশা কবছে। সে চোখ
বুঁজে নিঃসারে পড়ে রইল, যদিচ সে পবম আগ্রহে ফ্ল্যাটেনের
প্রতিটি মুখ-ভঙ্গিমা অনুধাবন কববাব চেষ্টা কবতে লাগল।

“সে কথা তো তোমাকে আজ পর্যন্ত না হো’ক হাজাব বাব
বলেছি।’

“কই আব বললে! কেন বলত সব কথা তুমি আমাব
কাছে গোপন কবতে চাও?”

“কি আবাব গোপন করলাম তোমাব কাছে? প্রফেসর
গ্রেগাব্‌সনকে আমি লিখেছিলাম একজন নরউইজিয়ান হাউস
কিপাব ঠিক করে দেবাব কথা। বাস্—তাব পবেই—”

“কিন্তু এত লোক থাকতে তাঁকেই বা এ অন্তবোধ কবতে
গেলে কেন?”

গভীর আগ্রহে বেগিণী চোখ খুলে ফ্ল্যাটেনেব মুখের দিকে
তাকিয়ে রইল যদিচ সে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন শুধু
হাসবাব জন্তেই সে চোখ মেলে তাকিয়েছে।

কিঞ্চিৎ বিরক্তস্ববে ফ্ল্যাটেন উত্তর দিলেন, “শোন কথা।
আমরা যে এক দেশেরই লোক—তা’ ছাড়া প্রফেসর আর
আমি বালাবন্ধু। সেই স্ববাদে আমি যদি তাঁকে কোন একটা

চিঠিতে এমনি একটা অনুরোধ করে থাকি, তা' হলে অস্বাভাবিক কি হয়েছে শুনি?" তার পর খুবই বিরক্তভাবে বললেন, "কিন্তু তুমি কি আজ আর শোবেই না ঠিক করেছ?"

বেগিণা সিগারেটের শেষাংশটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগে তার সব' অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল কিন্তু কষ্টে সে ভাব দমন করবার জন্তে সে শ্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে সে ছাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যেন অবাক হয়ে গেছে এমনিভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "আচ্ছা, প্রসূতিভবনেব ডাক্তারদেব সঙ্গে কতো রকমের মেয়েবই তো আলাপ থাকে, তা জানত?"

"তা থাকাই তো স্বাভাবিক।"

"ধর যদি তাদেরই কাউকে পাঠিয়ে দিতেন তিনি?"

হাঁই তুলে ফ্ল্যাটেন বললেন "এত আজগুবি চিন্তাও তোমাব মাথায় আসে?"

বেগিণা অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। না, সত্যিই তাহলে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু শেষ সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্তে সে উঠে গিয়ে খাটের ধাবে বসে পড়ল। তারপর ফ্ল্যাটেনের মাথাটা কোলেব ওপর তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্ল্যাটেন স্নেহভরে তাকে আরও কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করলেন কিন্তু বেগিণা প্রতিরোধ করে বললে, "তোমার মত স্বামী পেয়েছি বলে নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবতী বলে মনে হচ্ছে।"

“সত্যি নাকি?”

“সত্যি বলছি। আমাকে নিয়ে তোমার অযথা কৌতূহল নেই, এমন কি আমার বিগত জীবন সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে চাওনা তুমি।”

এ কথায় ফ্ল্যাটেনের মুখে যেন বিষাদের ছায়া নেমে এল। রেগিণাব চূলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শ্লান হেসে তিনি বললেন, “তার জন্তে আর তাড়াতাড়ি কি! লক্ষ্য করেছি নিজের থেকে তুমি বিশেষ কিছু বলতে চাও না। অবশ্য তোমাকে যতটুকু পেয়েছি তাতেই আমি খুসী। তার বেশী পাবার আমার লোভ নেই। একদিন যখন আমরা পরস্পরকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানবার অবসর পাব, সেদিন আর আমাদের কিছুই অজানা থাকবে না।”

পরিপূর্ণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে ফ্ল্যাটেন রেগিণার দিকে চেয়ে রইলেন। রেগিণার অন্তর পূর্ণ হ’য়ে গেল। এক উদগত অশ্রুর প্রবাহ তার কণ্ঠ রোধ করে ফেললে। কিন্তু সে সাবধানে পূর্বপরিকল্পিত পথে এগিয়ে চলল।

“ক্রিষ্টানস্যাণ্ডে তোমার যে অনুঢ়া বোন আছেন তাঁর কিন্তু একটি পোস্তপুত্র নেওয়া একান্ত উচিত—নিঃসঙ্গ কুমারী জীবনের ভার কতই না দুঃসহ।”

আবার সে তীক্ষ্ণ, তির্যক দৃষ্টিতে ফ্ল্যাটেনের মুখের প্রতিটি রেখা পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করলে। কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বললে, “এবার ঐশ্বর্যকালে যখন নরওয়ে যাব তখন তোমার বোনের সঙ্গে আলাপ করে আসব, কি বল!”

“তা’হলে সত্যিই সে ভারী খুদী হবে। পোষাপুত্রের ব্যাপারটা সেই সময় উত্থাপন কেরো না হয়।”

এই কথা বলে ফ্ল্যাটেন হেসে উঠলেন। তাঁর নির্মল প্রাণখোলা হাসিতে রেগিণা অনেকটা আশ্বস্ত হ’ল। তা’হলে তিনি তার সম্বন্ধে সত্যিই কিছু জানেন না এবং এতদিন ধরে সে যে সমস্ত সন্দেহ পোষণ কবে আসছিল সেগুলো ভিত্তিহীন।

রেগিণা পোষাক ছেড়ে বিহানায় স্তম্ভ গিয়ে দেখল ফ্ল্যাটেন অবোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন। তাঁর ঘুমন্ত মাংসল মুখের দিকে সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আহা, বেচারী সারা সন্ধ্যাবেলাটা নেচে নেচে সত্যিই কাবু হয়ে পড়েছেন।... যাক্ এতদিনে তাব সমস্ত সন্দেহেব অবসান হ’ল। কত কিছুই না সে এতদিন ভেবে মরছিল— কত অনর্থক হাস্যকর সন্দেহ!...বিবাহ-রাত্রে তারা উভয়ে যখন অল্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রেগিণার তখন এ ভেবে খুবই আনন্দ হচ্ছিল যে বোধ হয় এতদিন পবে তার জীবনের অখণ্ড হৃদশা থেকে সে চিরতরে মুক্তি পেল। কিন্তু এখন তাব মনে হতে লাগল যে সে ভুল করেছে। একমাত্র অর্থ ছাড়া ফ্ল্যাটেনের কাছ থেকে অণু কিছু আশা করা যায় না।

বাতিদান থেকে একফালি শীর্ণ নীলাভা ফ্ল্যাটেনের মুখের ওপর পড়েছে। রেগিণা সেইদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইল। ভাবলে, মনের বিভ্রান্ত অবস্থায় যে পথ সে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে, সেটা কি ভুল পথ? যে আশায় সে বৃদ্ধ ক্লাটেনের শয্যাসজিনী হ'তে স্বীকৃত হয়েছে, সে আশা তবে কি ব্যর্থ হবে? হয়ত এই লোকটির আদরে ও সোহাগে সে তার সমস্ত পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে, এই সহজ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে। যারা তাঁব সম্মানকে কেড়ে নিয়েছেন, এটা তাঁরা দিব্যদৃষ্টিতে পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন। হয়ত এই বিবাহ তাঁদেরই পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্তের একটা ধাপ মাত্র। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁদের চালে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি।

তার অন্তর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এ কথা একশবার সত্যি, নইলে তুমি তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে এমনি ভাবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জীবন কাটিয়ে দাও? সামান্য আদরে গলে গিয়ে তোমাব অতীত গ্লানিকব জীবনের কথা ভুলে যাও? তাঁদের কিছুমাত্র ভুল হয়নি। সত্যিই তুমি পৃথিবীর এক ঘণ্যতম জীব।

বাইরের নৈশ স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ কবে শীতের হিমেল বাতাস তখন যেন ক্রুদ্ধ গর্জনে মাতামাতি স্রু কবে দিয়েছে।

চৌদ্দ

রেগিণা যখন ফ্ল্যাটেনকে বিয়ে করতে মত দেয় তখন সে অতটা খুঁটিয়ে দেখেনি যে পরে কি করে সে এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবে। এখন এইটেই তার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যদি ছেলেকে খুঁজে বের করতে হয় এবং চলনার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে সম্মানজনক জীবনযাত্রা শুরু করতে হয় তা'হলে নিজেকে মুক্ত করার যে কোন একটা সহজ পথ তাকে যত শীঘ্র সম্ভব বের করতেই হবে। স্বামীকে আব মুক্তিদাতা মনে করবার কোন কাবণ নেই। বরং তিনি এখন অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এক শ্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দিন দিন তিনি তাকে এক অচ্ছেদ্য স্নেহ-পাশে জড়িয়ে ফেলছেন। সেই নাগ-পাশ থেকে মুক্তি পাওয়াই এখন তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

যতক্ষণ ফ্ল্যাটেন অফিসে থাকেন ততক্ষণ রেগিণা শান্তেব উন্মনা মধ্যাহ্নে একাকী উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সেই বৃহৎ অট্টালিকা ব ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়। কোন কাজ তা'ব ভাল লাগে না, কেন না কাজ করতে গেলেই বেশী করে মনে পড়ে যায় যে সে বিবাহিতা। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন রেগিণা প্রতিমুহূর্তেই ফ্ল্যাটেনের প্রত্যাবর্তন আশঙ্কা করে। যতই তাঁর ফিরে আসার সময় এগিয়ে আসে ততই সে ভয়ে কাঁচ হয়ে যায়। এখন সে ফ্ল্যাটেনের স্নেহের অত্যাচারকেই ভয় করে বেশী, কেন না, সে অনুভব করে যে এই স্নেহাশ্রয়ই তাকে

তাব কর্তব্য ভুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কি ক'রে যে সে এই উৎপাত থেকে অব্যাহতি পাবে তারও কোন সহজ পথ খুঁজে পায় না। এমনি করে দিনেব পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। সে একান্ত নিরুপায়ের মত সেই সময়-প্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে চুপটি করে বসে থাকে। তার কেমন যেন মনে হয় অঙ্গুলি-হেলনের মত শক্তি ও কর্মোত্তম ও বুঝি আর অবশিষ্ট নেই।

মাকে সে নিয়মিত চিঠি লেখে বটে কিন্তু সেই সব চিঠিতে যেন প্রাণেব স্পর্শ থাকে না। অত্যন্ত নিবস ও বস্তুতান্ত্রিক পত্রের ছত্রে ছত্রে দরদ ও প্রীতি-মধুব অভিব্যক্তির পরিবর্তে সে গুঁজে দেয় গোছা গোছা নোট। মায়ের দিক থেকে জবাব এলে সে সেগুলি না পড়েই পকেটে গুঁজে রেখে দেয়। সপ্তাহেব পর সপ্তাহ ধরে সেই অপঠিত চিঠিগুলি পকেটে পকেটেই ঘোবে। চিঠিগুলি যেন তাকে তার লজ্জা ও সঙ্কোচের কথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়।

সারা সকাল বেলাটা রেগিণা তার সেই ছোট্ট ঘরটিতে বসে বসে চা আর সিগারেট খেয়ে খেয়েই সময় কাটিয়ে দেয়। অগ্নিকুণ্ডেব রক্তিম আভা রূপোর চা-দানে ও চিনেমাটির বাসনে প্রতিফলিত হতে থাকে। সেই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটি ঘিরে সিগারেটের নীলাভ কুণ্ডলীগুলি ক্রমাগত ওপর দিকে উঠতে থাকে। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রেগিণা কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়।

কিন্তু এই নিরুত্তম ও অলস জীবনযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে তার ছেলেটির কথা খুব বেশী করে মনে পড়ে যায়। তারই

বঙ্গীন স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে যায়। ভাবে, সত্যিই যদি সে সম্ভ্রানকে ফিবে পায় তা'হলে কি ভাবে তাকে লেখাপড়া শেখাবে, মানুষ কবে তুলবে—এই সব। সে নিজেকে এক আত্ম-তুষ্টা, বুদ্ধা জননীরূপে কল্পনা করে। চিন্তা কবে, তার ছেলেটি যেন একজন সর্বজনপ্রিয়, গণ্যমান্য লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা'বা যেন ছ'টিতে দূবে, বহুদূবে মেডিটাবেনিয়ানের ধাবে একটি শাস্ত্র কুটিবে বাস কবছে। ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গনটিতে যেন এ'টি স্ত্র-পবিকল্পিত গৃহোচ্ছান বয়েছে। সেই বম্য বাগানে তা'ব প্রিয় ফুলগুলি ফুটে বয়েছে। সন্ধ্যাগমেব সঙ্গে সঙ্গে সেই মায়াকুঞ্জের ওধাবে ঘন সাইপ্রাস-বৃক্ষের মাথাব ওপবে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। আব তা'বা তখনে কোলা বাবান্দাটিতে ছড়িয়ে বসে স্বদেশেব গান গাইছে।

কখনও সে কল্পনা কবে, সে যেন তা'ব ছেলেটির হাত ধবে চার্চে চলেছে। অর্গানেব স্ত্র-মধুব স্তব-ঝংকাব চাবিদিকে প্রাতিধ্বনিত হচ্ছে। আনন্দের হিল্লোলে তা'ব হৃদয় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তা'ব জীবনের সমস্ত পাপ ও সম্ভ্রাপ যেন সেই স্ত্র-মধুব স্তবস্পর্শে একমুহূর্তে ধুয়ে মুছে গেল। মনে হ'ল সে যেন সর্বভ্যাগিনী সন্ন্যাসিনীদেব মত নিমল ও আত্মত্যাগেব জীবন যাপন করছে।

ফ্যাটেন এসে পড়তেই ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। স্বপ্ন কেটে যেতেই জেগে উঠল কঠোব বাস্তবতা। বেগিণা মনে মনে ভাবলে,

আর কতদিন এই চলনাময় ঘূর্ণিত জীবনেব গুরুভার টেনে বেড়াতে হবে? তাব এই অভিশপ্ত নিঃসঙ্গ জীবন কি কোন অংশেই একজন গৃহহারা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের চেয়ে কাম্যতর?

এমনি ভাবে স্বপ্নেব ঘোরে ও নিরর্থক চিন্তায় ব্যাপ্ত থেকে বেগিণা আলস্তে ও নিরুত্তমে দিন কাটাতে লাগল। সে আশ্চর্য হ'ল এই দেখে যে এখনও সে যে শুধু এই বাড়ীতে বাস কবছে তাই নয়, এখনও সে আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে নতুন নতুন জামা-কাপড়ে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলছে আব নিত্য কবছে নব নব অঙ্গবাগ আব প্রসাধন। একবাবও ভাবছে না, কি লজ্জাকব গুরু মূল্যে সে এই সব সজ্জাবস্ত্র ক্রয় কবছে।

এখন থেকে সে ঘূমেব জন্তে একটু একটু আফিম খাওয়া ধবলে। সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গাব পব সে নিজেকে বড বেশী দুর্বল বোধ কবতে লাগল। দুপুরবেলা পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠতে পাবত না। ক্রমশঃ আত্মবিধ্বাসেব সমস্ত শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলল। ফ্ল্যাটেন প্রথমটা অতশত লক্ষ্য কবেন নি, মনে কবেছিলেন যে যুবতী স্ত্রীলোকেবা হযত বিশেষ অবস্থায় একটু বেশী বকম ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। ঝোঁকেন কাবণও তিনি যেন কিছু কিছু আন্দাজ করতে পাবছিলেন। তিনি প্রত্যহ সেই আনন্দ-মুহূর্তেব জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা কবছিলেন যখন বেগিণা তাঁর কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলবে, 'ওগো ভূমি সন্তানেব পিতা হতে চলেছ।'

বেগিণার কিন্তু ফ্ল্যাটেনের আদর ও উচ্ছ্বাস দিন দিন

অসহ্য বোধ হতে লাগল। শব্দনকশের চিন্তামাত্রই তার কান্না আসত। কাজের জন্তে ফ্ল্যাটেন যখন মাঝে-মধ্যে গুটেনবার্গ যেতেন তখন রেগিণা হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। মনে মনে প্রার্থনা করত এই যাওয়াই যেন তাঁর শেষ যাওয়া হয়। চোখ বন্ধ করে নিজের সেই মুক্ত অবস্থা কল্পনা করতে ভারী ভাল লাগত তার। ভাবত, যদি তেমন কিছু ঘটে তা'হলে তার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সে তার বিলিয়ে দেওয়া ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে আব এখনকাব সব কিছু বন্ধন কাটিয়ে উঠে নতুনভাবে জীবন সুরু করতে পারবে।

ফ্ল্যাটেন কিন্তু সেবাবে হাসতে হাসতে অক্ষত অবস্থায় বাড়ী ফিবে এলেন। ছ'জনের প্রথম দেখা হতেই দুই ব্যাগ বাছ মেল ফ্ল্যাটেন বেগিণাকে নিবিড়ভাবে বকে জড়িয়ে ধরলেন। এই কৃতবিদ্ এবং বন্ধিমান বুদ্ধিটি তাঁর তরুণী ভাষার সম্মুখে এলেই কেমন যেন নিজেকে সম্পূর্ণ হাবিয়ে ফেলতেন। উপহারের পর্ব উপহাব দিয়ে তার তরুণ চিত্ত ভয় কববার জন্তে ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। এতে বেগিণাব অপমান বোধ করত। মনে হত এই বিভিন্ন উপহারের ডালি তাকে নতুন করে স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধবার চেষ্টা করছে। বাইবে অবশ্য সে এই অসন্তোষ যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে তাব জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করত। সুতরাং সেই সব দামী দামী উপহার সে হাসিমুখেই গ্রহণ করত, পাছে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে চোখের জলে আসল কথাটাই ধরা পড়ে যায়।

একদিন অফিস যাবাব পূর্বে ফ্ল্যাটেন বেগিণার খাটের ওপর বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি ব্যাপার বলত ? আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে !”

রেগিণাব মাথাব মধ্যে দিয়ে অকস্মাৎ তবিত্-প্রবাহ বয়ে গেল। সে ভাবল, তাহলে স্বপ্নেব ঘোবে সে কি কোন কথা ফাঁস করে দিয়েছে ?

ফ্ল্যাটেন ঝুঁকে পড়ে, তার কাণের কাছে মুখ নামিয়ে ধবলেন, বললেন, “তোমার কি ছেলে-পুলে হবে ?”

এক শ্লেষপূর্ণ হাসির দমকে বেগিণা ফেটে পড়ল। তাই বটে, তা’হলেই বোলকলা পূর্ণ হয় বটে !

তাব মাথায় এক ছুঁছুঁদ্ধি এল, ভাবলে ঠিক হয়েছে, ওঁকে একটু বোকা বানান দবকার। সে জোর করে খানিকটা হাসি টেনে এনে বললে, “তোমার চোখে কি কিছুই এড়ায় না ?”

ফ্ল্যাটেন এমন কবে বেগিণাকে জড়িয়ে ধরলেন যে তার দম বন্ধ হবার জোগাড়। তারপব তিনি প্রায় নাচতে নাচতে খব থেকে বেড়িয়ে গেলেন। তখন থেকে তিনি সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। যে ভবিষ্যৎ বংশধব আসছে তার জ্ঞাত প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে যেতে চান তিনি।

সেইদিন থেকে ফ্ল্যাটেন সময়ে-অসময়ে এই আনন্দ সংবাদটি যত্র তত্র বলে বেড়াতে লাগলেন। রেগিণার সমাদরও যেন সেই অনুপাতে বেড়ে গেল। রেগিণার কিন্তু একবারও ইচ্ছা হ’লনা সত্য কথাটা ফাঁস কবে দিয়ে ফ্ল্যাটেনের এই স্বতঃস্ফূর্ত

উচ্ছ্বাসে বাধা দেয়। তা' ছাড়া ফ্ল্যাটেনকে বোকা বানিয়ে সে বেশ আমোদ বোধ করতে লাগল। একদিন না একদিন সত্য অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে, কিন্তু ততদিনে তাকে একটা কিছু পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

রেগিণা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ক্রমশঃ নিরঙ্ক অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। যতই তার মন দমে যেতে লাগল, ততই সে তার সম্ভাবনের চিন্তাকে বেশী করে আঁকড়ে ধরলে। সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার শিশুটি অস্থিরে কাতরাচ্ছে, অথচ সেবা করবার জন্মে কেউ ছুটে আসছে না। শিশুটিকে স্পষ্ট যেন সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, এমন কি তার গলার স্বব পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে। শিশুটি তাব কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্মে দুটি ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু সে এত দূরে রয়েছে যে অতদূর থেকে তাব নাগাল পাচ্ছে না।

এমনি বিচিত্র চিন্তার মধ্যে একদিন বড়দিন এসে গেল। তুষারচ্ছাদনে মাঠ গেল ঢেকে। গাছের চিক্চিকে পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যকিরণ পিছলে পড়তে লাগল। বহুদূরব নীচু উপত্যকাভূমি দিয়ে মাঝে মাঝে এক-আধটা ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে ছুটে চলেছে। তুষার পতনের ফলে গাছের ডালগুলিকে সাদাটে দেখাচ্ছে। গাছগুলিও ঈষৎ অবনত হয়ে পড়েছে। এখন বাইরের লোকজনের যাতায়াত কমে এসেছে কারণ ফ্ল্যাটেন বড় একটা কাকেও নেমতন্ন করেন না, নিজেও

কাকব বাড়ী যান না। দিনগুলি যেন একঘেয়ে ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। ফ্ল্যাটেন অধিক বানি পর্যন্ত নিজেব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কারণ পূর্বের মত সকাল-সকাল বাড়ী ফিরে আসাব উদ্দাদনা আজকাল আব তেমন অমুভব ববেন না।

বোজ সকালে রেগিণা ঘুম থেকে উঠে প্রতিজ্ঞা কবে, আজ যেমন কবেই হোক একটা হেস্ট-নেস্ট করবে, কিন্তু কি কববে ভেবে পায় না। সে কি এখান থেকে চলে যাবে? তাহলে তো পূর্বের মতই দুববস্থা হবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী কব'ত পাবে বটে কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অমন একটি জটিল ব্যবস্থা তার মনঃপুত হ'ল না।

মাঝে-মাঝে তাব মনে হয়, তাব স্বামীব অর্থ আর বোধ হয় তাব প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তা' হলে ত ঘটনাপুঞ্জব পুনবাবুত্তি হবে মাত্র ১ সে ভেবে দেখলে বাবে বাবে পেছন ফিরে না তাকিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়াই এখন তাব একমাত্র কর্তব্য।

কতো দিন সে ভেবেছে কত না বিভিন্ন উপায়ে মানুষেব মৃত্যু ঘটান যেতে পাবে। সে এ বিষয়ে এত বেশী চিন্তা করেছে যে এ চিন্তা আর তাব কাছে ভয়াবহ বলে মনে হয় না। তাব মনে হল, নিত্য নতুন অপবাধ করার চেয়ে একবার একটা নৃশংস অপরাধ করাও ঢের ভালো, অবশ্য তাতে যদি অভীপ্সিত বস্তুটিকে লাভ করা যায়।

একদিন হঠাৎ বেগিণার নজরে পড়ল ফ্ল্যাটেন তাঁর প্রথমা পত্নীর ছবিটির নীচে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে

আছেন। সেই মুহূর্তে তাঁর অভিপ্রায় যেন সুস্পষ্ট অক্ষরে তাঁর মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে। রেগিণা ব্যাঙ্গের হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে বুদ্ধ যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। কি একটা অপরাধ কবতে গিয়ে তিনি যেন হাতে-নাতে ধবা পড়ে গেছেন। রেগিণা লক্ষ্য করলে, এই ক’দিনে ফ্লাটেনেব চোখ-মুখ অসম্ভব বকম বসে গেছে। মোটা-সোটা লোকটাকে এখন অসম্ভব স্নান ও দুর্বল দেখাচ্ছে। তিনি যেন হঠাৎ বেশ বুড়িয়ে গেছেন। এক মুহূর্তের জ্ঞা বেগিণার ভারী কষ্ট হ’ল তাঁকে দেখে। মনে হ’ল অন্ততঃ একটি দিনেব জ্ঞাও তাঁর সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ও সন্দয় ব্যবহার করা উচিত।

অল্প কয়েক দিনেব মধ্যেই বেগিণা টেব পোলে যে সে পুনবায় সম্ভানের জননী হতে চলেছে। এই সম্ভাবনাব কথা কোনও দিনও সে মনেব কোণে ঠাঠ দেয়নি। বেশ কয়েক দিন সে মনমরা হয়ে বইল। কোন এক অদৃশ্যবর্তী শত্রু যেন অকস্মাৎ পেছন দিক থেকে আক্রমণ কবে তাকে কাবু করে ফেলেছে। যদিও সে একজন ভ্রষ্টা ও বিপথগামিনী স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু নয় তবুও এতদিন পর্যন্ত মাতৃ তার কাছে একটি পবিত্র ও নিষ্কলুষ অনুভূতি ছিল সম্ভানের চিন্তামাত্র তার মনে হ’ত সে যেন একটি ছোট্ট মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ ?...

আজ যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে সে প্রতিনিয়ত চাতুরী করেছে, ছলনা করেছে এবং যাকে হত্যা পর্যন্ত করতে সে কুণ্ঠিত নয়,

সেই কিনা তাকে বাধ্য করছে আরও একটি ফ্ল্যাটেন বংশধরকে এই পৃথিবীতে আনতে। কে বলতে পারে, এই বালকই একদিন উদ্ভবকালে তার পিতার প্রতি ছর্ব্যবহাবের প্রতিশোধ নিতে চাইবে কি না? হয়ত এই শিশুটিই একদিন তার মাতৃদেব ঋণ ভুলে গিয়ে, তার নিজের সম্ভানের একমাত্র প্রতিবন্ধকরূপে তাকে চিরকালের জন্য ফ্ল্যাটেন-পরিবারের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনে বেঁধে ফেলবে!

বেগিণা বিছানায় শুয়ে চটফট্ কবতে লাগল। তার শেষ উত্তাপটুকু পর্যন্ত কে যেন ববফ ঘসে ঠাণ্ডা কবে দিয়েছে। এক অব্যক্ত ঘৃণাব ঢেউ যেন সর্পাঘাতে বিষক্রিয়াব মত তার সর্বাঙ্গ বেয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল।

পনেরো

রেগিণা যখন নীচে নেমে এল তখন তার শুকনো ও ফ্যাকাশে মুখ দেখে মনে হ'ল যেন সারারাত তার ঘুম হয়নি। ইতিমধ্যে সে মন স্থির করে ফেলেছে। সারা সকালবেলাটা সে চিন্তাক্লিষ্ট মনে, এঘর-ওঘর ক'রে কাটিয়ে দিলে।

ছপু্রে খাবার টেবিলে তাকে পূর্বের মতই প্রফুল্ল বলে মনে হ'ল। ফ্ল্যাটেনও প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। খেতে খেতে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হতে লাগল। রেগিণা হঠাৎ একসময় নিশ্চুপ হয়ে ফ্ল্যাটেনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বইল। এটা ফ্ল্যাটেনের দৃষ্টি এড়াল না। প্রতিমুহূর্তেই তিনি আশঙ্কা করতে লাগলেন এইবার বুঝি বেগিণা বেয়াদপ কথা একটা কিছু বলে বসে!

কিছুক্ষণ পব রেগিণা মৌন ভঙ্গ করে হঠাৎ বলে বসল, “আজ তোমাকে এমন একটা খবর শোনা য়া’ তোমার কল্পনারও বাইরে।”

“কি এমন কথা?”

“তোমার এখানে আসবার আগে আমার একটি খোকা হয়েছিল।”

রেগিণা অত্যন্ত সহজভাবে এই কথা কটি বলে গেল। এমন কি তাঁর ঠোঁটের কোণে এতক্ষণ যে মুহূ হাসিটি লেগেছিল, সেটারও কোন বিকৃতি ঘটল না। ফ্ল্যাটেনের হাত থেকে চামচে খসে পড়ল। তাঁর মুখখানা মুহূর্তে ছাই-এর মত বিবর্ণ ও

সাদাটে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পব বেগিণাব দিকে নিম্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি অত্যন্ত মুহূর্তে যেন স্বগত উচ্চারণ কবলেন, “বল কি।” তারপব যেন মন্ত একটা মজাব কথা শুনেছেন এমনভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে হেসে বার বার সেই এক কথাই উচ্চারণ কবতে লাগলেন।

বেগিণা শাস্ত্রস্ববে পুনবাবৃত্তি কবে বললে, “বিষেব আগে আমাব একটি ছেলে হয়েছিল।”

হতচকিত ভাবে বেগিণাব মুখেব দিকে অনেকক্ষণ এন্দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ক্ল্যাটেন। এ বকম ভাবে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁব যেন সন্দেহ হ’ল, ঠাট্টা নয়—বেগিণা কট সত্যি কথাই বলেছে। তাঁব মনে হ’ল, এইবাব বুঝি জ্ঞান হাবিয়ে তিনি মেঝেতে লুটিয়ে পড়বেন। রেগিণাকে তিনি যেন আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। সে যেন দূরে, অতিদূবে, দৃষ্টিব অতীত স্তবে সবে গেছে।

বহুক্ষণ ধবে উভয়েই নীববে, নতমুখে বসে বইলেন। তাবপব একসময়ে ক্ল্যাটেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মাতালেব মত টলতে টলতে খাবাব ঘব থেকে বেড়িয়ে গেলেন। ধীবে ধীরে তাঁব পদশব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতব হয়ে দূর বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বেগিণাব কেমন যেন স্থির ধাবণা হ’ল, এইবার বুঝি একটা পিস্তলের আওয়াজ কানে ভেসে আসবে। সে আঙ্গুল দিয়ে কান ঢেকে বহুক্ষণ সেই মুহূর্তটিব জগ্ৰে সভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর এক সময় নিঃশব্দে নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকল।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই হাউসকিপার এসে জিজ্ঞাসা করল, আজ আর তাঁরা সাপার খাবেন কিনা। বেগিণা শাস্ত্রস্বরে উত্তর দিলে, “না।”

হাউসকিপার চলে যেতেই রেগিণা সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী আকারে আস্তে আস্তে ওপরেব দিকে উঠছে। সেইদিকে রেগিণা অশ্রুমনস্কের মত চেয়ে আছে। তার হাত-পা অসম্ভব কাঁপছে। সে অধীর হয়ে চিন্তা কবছে, ‘এ আমি কি সব নাশ করলাম!’

বেগিণার মাথা ঘুরছে। তার মনে হচ্ছে সে যেন খাড়া পাহাড়েব ঠিক কিনাবাটিতে অনিবার্য পতনেব অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সে পুনর্বার তাব শিশুটির কথা চিন্তা করতে চেষ্টা কবলে। এতক্ষণে কিছুটা অশ্রুমনস্ক হবার মত সে যেন একটা উপলক্ষ পেলে। তাব সারা অঙ্গ এক অপূর্ব পুলকে ভরে উঠল। তার মনে হতে লাগল, এখন ঐ একটিমাত্র প্রাণীই এ পৃথিবীতে তার সব স্ব!

সারা বাড়ীটাতে এক অনৈসর্গিক স্তব্ধতা নেমে এসেছে। চাকর-বাকবেরা পর্যন্ত নিঃশব্দে চলাফেরা কবছে এবং চুপিসারে কথা বলছে। বরফেব স্তর থেকে ভেসে-আসা আলোকোচ্ছ্বাস এতক্ষণ ঘরের দেয়ালে দেয়ালে বিকীর্ণ হচ্ছিল--অকস্মাৎ ফিকে অন্ধকার গড়িয়ে এসে ঘবের প্রতিটি কোণাকে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে ফেললে। রেগিণা সেই প্রদোষ-অন্ধকারে সোফায়

শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত চিন্তা করতে লাগল, সম্ভাব্যের জগৎ ব্যাকুলতায় এ কি সর্বনাশ সে কবে বসেছে !

দীর্ঘ দু'তিন ঘণ্টা সময় কেটে গেল। রেগিণাব এই নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা আর সহ্য হচ্ছে না। সে জুতো খুলে ফেলে, পা টিপে টিপে, ফ্ল্যাটেনের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল। ঘরের মধ্যে জীবনম্পন্দনের কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। গা-চাবির ফুটো দিয়ে উকি দিয়ে দেখলে, ফ্ল্যাটেন জানালাব সামনে বসে, হাতের ওপব মাথা বেখে নিম্পন্দভাবে বসে আছেন। ঘরের ক্ষীণ আলোকে তাঁকে একটি অস্পষ্ট নিম্প্রাণ মূর্তিব মত দেখাচ্ছে।

রেগিণা আবার পা টিপে টিপে নোচে নেমে এল। প্রথমঃ রাত্রি গভীর হয়ে আসছে। বেগিণার কেমন যেন শীত শীত করছে। কিন্তু সেদিকে ক্রক্ষেপমান না কবে সে পূর্ববৎ পায়চারি করেই চলল। অবশেষে সে যখন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন খাটে গিয়ে মড়াব মত শুয়ে পড়ল।

যোলো

সন্ধ্যার পর সেই যে ফ্ল্যাটেন বেড়াতে গেলেন দ্বিপ্রহর রাতি হয়ে গেল তবু তাঁর ফিবে আসবাব নাম নেই। রেগিণার একটু তন্দ্রা এসেছিল, ঘুমের আবেশ ভাঙ্গতেই লক্ষ্য করলে যে, ফ্ল্যাটেন শয্যার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন। তখনও তাঁর পোষাক ছাড়া হয়নি। হাতে একটা বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি অস্ফুট-স্ববে কি যেন বলছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল, এতক্ষণ যেন তিনি নীববে অশ্রুবিসর্জন করছিলেন।

বাতিটা নামিয়ে বেথে বেগিণাব একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে ফ্ল্যাটেন শাস্তস্ববে বললেন, “রেগিণা, একথা তুমি আগে বলনি কেন? আজই বা বললে কেন? কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা কবেছি, সবদাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে শক্তি দেন। আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। এই কথা বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর গম্ভীর হয়ে এল, তাঁব চোখ জলে ভরে এল।

এখন আর তোষামোদেব কথা তার হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। রেগিণা ঘৃণাভরে ভাবল, যখনই কোন প্রবীণ, বয়স্ক লোক তরুণী ভার্য্য গ্রহণ করে তখন সে যেন তার পায়ে পোষা কুকুরের মত লুটিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু আমার কাছে সে নিয়ম খাটবে না, দবকার হলে আমি শক্ত হতেও জানি।

হাতের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটেন নৈশবাতি জ্বাললেন। রেগিণা তখনও মট্কা মেবে, চোখ বন্ধ কবে, ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। তিনি ভাবছেন রেগিণা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, নয়ত চিন্তা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। যা' ইচ্ছা ভাবুন তিনি, রেগিণার তাতে কিছু যায়-আসে না। ফ্ল্যাটেনেব শুয়ে পড়ার বহুক্ষণ পবেও রেগিণা তাঁব দীর্ঘনিঃশ্বাসেব শব্দ শুনতে পেল।

পরের দিন সকালে ফ্ল্যাটেন যথাবীতি অফিসে গেলেন। তিনি এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন মর্মদাহ ভুলতে তিনি কাজের ভেতব ডুবে যেতে চান। তা'বপব কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁব শিশু-স্বলভ সরল ব্যবহাবে বেগিণা অনেকটা আশ্রয়িত হ'ল। তা'ব মনেব মধো থেকে কে যেন চাৎকাব কবে বলে উঠল, অমন লোকের মনে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ!

রেগিণা পুনরায় সন্তানেব মা হতে চলেছে। এই উপলক্ষ-মাত্রেই রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সে ভাব'ল, এব সমাক প্রতিফল দেওয়া দরকাব। যথাকর্তব্য সে স্থিব কবে ফেললে।

আজ খেতে বসে স্বামী-স্ত্রী'ব মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বেশ খানিকটা বচসা হয়ে গেল। কয়েকদিন ধবেই ফ্ল্যাটেনেব মেজাজ বিগড়ে ছিল, সুতরাং আজ সহজেই তিনি রেগে উঠলেন। রেগিণা হঠাৎ খুব নির্লিপ্তভাবে বলে বসল, “একটা গোপন কথা তোমাকে আজও বলিনি, আমার গর্ভে তোমার যে সন্তান এসেছিল আমি তাকে মেরে ফেলেছি।”

ফ্যাটেন সবেমাত্র জলের গ্যাসটি মুখে তুলেছিলেন, এ কথা শোনামাত্র তাঁর হাত থেকে গ্যাসটি মেঝেতে পড়ে গেল। তিনি প্রথমে হাসতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পরমুহূর্তেই টেবিলের ওপর প্রবল বেগে একটা ঘুসি মেরে চাঁৎকাব করে উঠলেন, “নাঃ, বড্ড বাড়িয়ে তুললে দেখছি!”

ফ্যাটেন চোখ পাকিয়ে টেবিলের এ পাশে এসে দাঁড়ালেন। রেগিণা এমনভাবে বেড়ালের মত লাফিয়ে এগিয়ে এল, যেন পেলে এক্ষুণি সে ফ্যাটেনের টুটিটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ফ্যাটেনও তার হাত মুচড়ে ধরে চাঁৎকাব কবে উঠলেন, “বল, এ কথা তোমাব মিথ্যা!”

রেগিণা হাত ছাড়িয়ে নেবার ভ্রমো স্বস্তাস্বস্তি কবতে করতে বললে, “বললাম ত, আমি তাকে মেবে ফেলেছি।”

নিজের রূঢ় আচরণে লজ্জিত হয়ে ফ্যাটেন হঠাৎ রেগিণাব হাত ছেড়ে দিলেন এবং কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে তাব মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাবপব রাগে গস্গস্ করতে করতে বললেন, “তুমি আমাকে পাগল কবে তুলবে দেখছি, আমাকে খুন না করে কি তুমি ক্ষান্ত হবে না?” এই কথা বলে তিনি ছুটে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

পদশব্দ আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল এবং আবার ওপরের ঘরের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ কাণে ভেসে এল।

আবার সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে এল আর রেগিণা শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চলল। যথারীতি

সে শিশুটির সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতে লাগল। এইভাবে ক্রমশঃ তার মন শান্ত হয়ে এল। তখনও ফ্ল্যাটেনেব অশ্রাস্ত পদশব্দ অবিশ্রাম ঘরেব মেঝেতে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

সে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রেগিণা ফ্ল্যাটেনেব জন্তু শয়নকক্ষে অপেক্ষা করে বসে রইল, কিন্তু তিনি শুতে এলেন না। পরদিন প্রভাতে হাউসকিপার একখানা চিঠি এনে তার হাতে দিয়ে জানালে, বিশেষ জরুরী কাজে ফ্ল্যাটেন গুটেনবার্গ চলে গেছেন।

পরের দিন ফ্ল্যাটেনেব আব একখানা চিঠি পেল বেগিণা। সাবাবাত্রি ভেগে তিনি একখানা অতি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। রেগিণা আত্মস্থ চিঠিখানা পড়ে গেল। চিঠিখানি অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় মনে হ'ল তার কাছে। এখন সস্তা হৃদয়াবেগেব কি মূল্য আছে তার কাছে? দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠাব্যাপী যন্ত্রণা ও মনঃকষ্টের ব্যাপক ফিরিস্তি দেখে সে ঠোট বেঁকাল। তাবপব সুরু হয়েছে আত্মধিকারের বণনা। শেষে ফ্ল্যাটেন লিখেছেন, এখনও তিনি আশা করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁবা উভয়ে পরস্পরকে ভালবেসে এবং বিশ্বাস করে নতুনভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন। সব শেষে তিনি লিখেছেন, পরের দিন তিনি বাড়ী ফিরে আসছেন।

রেগিণা অবহেলাভাবে চিঠিখানাকে কোলের ওপর ফেলে রাখলে। তার বর্তমান অবস্থায় চিঠিখানি তার মনের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। সে চম্কে উঠে ভাললে, কালই তাহলে উনি বাড়ী ফিরে আসছেন। হয়ত ফিরে

এসেই তাকে জড়িয়ে ধবে ভলবাসা, ফমা, ভবান্ প্রভৃতি বড় বড় গালভবা কথা শোনাবেন। ন, সে চিন্তাও অসহ। সে কোন মতেই ঐ সব আকামী সহ্য কবাত পাববে না। তাব চেয়ে।

সে ক্ষতপদে তাব পডাব ঘবে গিয়ে ঢুবল। মনে হ'ল অন্ধকারে হাতবে হাতবে পথ চলতে গিয়ে সে যেন প্রতি-পদেই ঠোকব খাচ্ছে। তাডাতাড়ি একখণ্ড কাগজে বযেক লাইন চিঠি লিখে ফেললে। তাবপব চাকবকে ডেকে নিদেশ দিলে, চিঠিখানা যেন প্রথম ডাককট গুটেনবার্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত ব্যাপাবটা প্রতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধটে গেল। এতক্ষণে বেগিণা নিঃশ্বাস ফেলবাব অবসর পেলে।

সেই ছোট্ট চিঠিখানিতে মাত্র ঐ বযেকটি কথা লেখা ছিল :
“প্রিয় আত্ম,

তোমাকে কোন কথা গোপন কবা উচিত নয়। যে সন্তান আমি গর্ভে ধাবণ করছি তাব পিতা আমি নও।”

বেগিণা ভাবলে এহ-ই যথেষ্ট। আবাব নতুন কবে মিথ্যাব আশ্রয় নিয়ে সে নিজেকে হেয় কবহে বড়ে, কিন্তু ঐ বযেকটি কথাব ধাক্কা বৃদ্ধের পক্ষে সামলানো কঠিন হবে। বেগিণা চমকে উঠে অস্থিরভাবে ঘবময় ঘুবে বেডাতে লাগল। বাবে বাবে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, সত্যিই নববক্তে তাব হাত কলুষিত হয়েছে কি না। কিন্তু আর ত কোন পথ

খোলা নেই। সে আরও ভেবে দেখলে যে যতবারই সে ফ্ল্যাটেনকে আঘাত করতে গেছে ততবারই তিনি হাসিমুখে প্রেম জানাতে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু আর নয়, এবারে যা হোক একটা হেস্ট-নেস্ট হয়ে যাক।

কিছুক্ষণের জগ্রে রেগিণা তার পুত্রের চিন্তায় ক্ষান্ত দিলে। কারণ, ভেবে দেখলে, সে যে কু-কাজে লিপ্ত হতে চলেছে তার মধ্যে তার পুত্রের পুণ্যময় স্মৃতিকে টেনে আনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হবে। না, এ কাজের সমস্ত দায়িত্ব তার নিজের একলার। সে প্রমাণ করতে চায় যে, সে এজন হীনতম হত্যাকারিণী—বিবেকের দংশন-জ্বালা অবিভক্তভাবে সে একাই সহ্য করতে চায়।

বিকেল উত্তীর্ণ হয়ে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হ'ল। রেগিণার মনে হ'ল দেওয়ালৈব ছবিগুলো পর্যন্ত যেন অন্ধকাবে তাকে হাঁ কবে গিলতে আসছে। অত বড় বাড়ীর নিজ'নতায় সে হাপিয়ে উঠল। একা থাকতে আর তার সাহস হল না, অগত্যা হাউস-কিপারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেড়ল।

ববফ ভেঙ্গে তারা দু'জনে নীচবে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার বরফ তুলে দু'পাশে স্তূপাকার কবে রাখা হয়েছে। তুষারচ্ছাদিত ধূসর মাঠগুলির ওপরে মেঘভরা একখণ্ড আকাশ আশু বর্ণের অপেক্ষায় যেন ঝুলে রয়েছে। মেঘের স্তরের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও বা দু' একটি হলদে তারা জ্বল জ্বল করছে। তারা দুজনে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে অনেক ঘোবাঘুবিন পব ক্রান্ত হয়ে তারা বাড়ী ফিরে এল। ফাঁকা হাওয়া বেগিণার এতক্ষণ বেশ ভালই লাগছিল। বাড়ী ফিবে এসে যখন খাবার টেবিলে গিয়ে বসল তখন তাব হাত-পা বাঁতিমত কাঁপতে লুক করেছে। সে যেন শিবায় শিরায় বিছুৎ-শিহবণ অনুভব কবলে। গ্রাসেব পর গ্রাস সে মদ খেয়ে চলল। অবশেষে যখন বাবি গভীর হয়ে এল তখন গ্রাসটিকে পাশেব টেবিলে সবিয়ে বেখে অন্ধকাবে হাতবাতে হা-বাতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

অত্যধিক মত্তপানের ফলে পবেব দিন অনেক বেলায বেগিণাব ঘুম ভাঙল। সে অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে শুয়ে বইল। সে যেন কিছু একটা খববেব জ্ঞা তখনও সাগ্ধে প্রতীক্ষা কবছে। ঘটা বাজিয়ে পরিচাৰিকাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবলে, তাব নামে কোন 'তাব' এসেছে কি না। কোন টেলিগ্রাম আসেনি শুনে সে উঠে পড়ল। নৈশবাসেব ওপব ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে সে অস্ত্রিব-ভাবে ঘবে বেড়াতে লাগল। পূববানে অত্যধিক মত্তপানেব ফলে মাথাটা তখনও ঝিমঝিম কবছিল। জানালাব পব্দাটা সরিয়ে সে বাইবেব ঘনবনের দিকে নিছক্ষণ তাকিয়ে বইল। গোটা উপত্যকাভূমি তখনও পাতলা কুয়াসাব জালে জড়িয়ে আছে। সে প্রতিমুহূর্তেই আশা কবতে লাগল, এইবাব বৃষ্টি সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দুঃস্বাদটি এসে হাজির হয়।

দবজায় মুহু টোকান শব্দে চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখে, অণু কিছু নয়, পরিচাৰিকা অশ্রান্ত দিনেব মত প্রাতঃকালীন কফি

পরিবেশন কবতে এসেছে। যতই বেলা বাড়তে লাগল ততই বেগিণাব ভয় কবতে লাগল। অবশেষে তাব স্থিৰ বিশ্বাস হ'ল, এবাব যে কোন মুহূর্তে ফ্ল্যাটেন হয়ত সশব্দে এসে হাজির হবেন।

বিকেলের দিকে বেগিণা শোবাব ঘবেব বাবান্দায় ঝুকে পড়ে বাস্তাব দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ লক্ষ্য কবলে, দুবে টেলিগ্রাম পিওন আসছে। বিছুক্ষণ পযন্ত সে ভড়িতহতেব মত বাবান্দাব বে'লং ধবে দাঁড়িয়ে বইল, তাবপরই ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আপাদমস্তক চাদব ঢাবা দিয়ে শুয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট পবে'ই হাউসকিপাব একখানা টেলিগ্রাম এনে বেগিণাব হাতে দিল। গুটেনবার্গে ফ্ল্যাটেন যে হোটেল উঠেছেন সেখানকাব ম্যানেজাব 'তাব' কবেছেন, গত রাত থেকে ফ্ল্যাটেন হঠাৎ অন্তস্থ হয়ে পড়েছেন।

একটু' সামলে নিয়ে বেগিণা তাব স্বামীব হেড ক্লার্ককে ডেকে পাঠিয়ে আদেশ দিলে, তান যেন অবিলম্বে গুটেনবার্গ চলে যান এবং সেখানে পৌঁছেই তাব স্বামীব শাশীক অবস্থা জানিয়ে 'তাব' কবেন।

হেডক্লার্ক চলে যেতেই বেগিণা আবাব শুয়ে পড়ল। ঘণ্টার পব ঘণ্টা ধবে সে শুয়েই বইল। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল কিন্তু একপ বিভ্রান্ত অবস্থায় প্রার্থনা করাব কথা তাব একবাবও মনে এল না।

সন্ধ্যার দিকে হেডক্লার্কের 'তারে' জানা গেল, ফ্ল্যাটেনের মৃত্যু হয়েছে।

সতেরো

এই শেষবারের মত রেগিণাকে আর একবার মুখে মুখোঁস আঁটতে হোল। গুটেনবার্গে গিয়ে সে স্বামীর অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলে। ফ্লাটেনেব কয়েকটি ব্যবসায়ী বন্ধু মাত্র উপস্থিত ছিলেন। নব্বুয়ে থেকে কাটকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কোন আত্মীয়-স্বজন এমন কি ফ্লাটেনেব দু'জন ভগ্নীকেও কোন সংবাদ দেওয়া হয়নি।

যখন স্বামীর শব্দধারটি আগুনে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন রেগিণা একবার আকুল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। সবাই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অগ্নিক্ষণের মধ্যে শেষ-কৃত্য চুকে গেলে উপস্থিত সকলে টুপি তুলে রেগিণাকে বিদায় জানিয়ে, যাবার কাজে চলে গেলেন। রেগিণা হেডক্লার্কের কাছে ভব দিয়ে নৌববে অশ্রু-বিসর্জন কবছিল। মনে হ'ল এই আকস্মিক বিপদে সে যেন খুব ভেঙ্গে পড়েছে।

সেই বিকেলে রেগিণা নব্বুয়েগায়ী ট্রেনে চোপ বসল। হেডক্লার্ক বিপরীত দিকেব আসনে বসে রেগিণাকে নানাভাবে সাস্থনা দেবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সে কোন কথায় কান না দিয়ে অগ্নমনস্কের মত চুপ কবে চোখ বন্ধ কবে বসে ছিল। তাব মনের অন্তরে যে ভাবতরঙ্গ খেলছিল সে প্রাণপণে তা' দমন করবার চেষ্টা করছিল।

অবশেষে বেগিণী সেই নিঃসঙ্গ বাড়ীতে একা ফিবে এল। এখন এ বাড়ীর সব কিছুই তাব নিজেব। যতদিন পযন্ত না তাব বিষয়-সম্পত্তিব একটা বিলি-ব্যবস্থা হয় ততদিন সম্পত্তি-পরিচালনাব ভাব সে হেড ক্লার্কের ওপব ছেড়ে দিলে।

কিন্তু বেগিণীর মুক্তি কোথায়? এ বাড়ীব সব কিছুব সঙ্গেই ফ্ল্যাটেনের স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে, অথচ যতদিন পযন্ত না তাব গর্ভেব সম্ভান ভূমিষ্ঠ হয় ততদিন পযন্ত এ বাড়ীব সঙ্গে সে শেকল দিয়ে বাধ। তাব নিজেব সম্ভানের খোজ-খবর ততদিন পর্যন্ত নেবাব কোন সুযোগই সে পাবে না—এই চিন্তামান্টে তাব মেজ্জ অসম্ভব বকম বিগড়ে গেল। এই সব হাঙ্গামা চুকতে যাকে বলে মার্চ মাসে শেষেব দিক। ততদিন সময় কাটানো ছাড়া আব উপায় কি।

বেগিণী ভাবতে লাগল, এখন যে সম্ভান তাব গভে ক্রণাকাবে অবস্থান কবচে নিতান্ত অসহায়েব মত, স হয়ত উত্তরকালে একদিন বিচারকের ভঙ্গীতে আয়দণ্ড তুলে ধববে তাবই বিক্রে। কিন্তু তবুও তাকে ধারণ কবা ও বক্ষা কবা তাব ধম ও কর্তব্য। সেই পুণ্যময় কর্তব্য-পালনে সে তৎপব হ'ল।

এমনি ভাবে নীরস দিনগুলি কেটে যেতে লাগল। বেগিণী কোনমতে নিজেকে খাড়া রাখবাব জন্তে তাব নিকর্দষ্ট সম্ভানের চিন্তায় আরও বেশী কবে নিজেকে মগ্ন রাখলে। তাব একমাত্র আশা, তার নিজের সম্ভানটি একদিন বড় হয়ে উঠে তাকে সমস্ত দুরদৃষ্ট থেকে রক্ষা কববে। তার দক্ষভাগ্যে যতই লাঞ্ছনা

আম্বু ক না কেন, সমস্তই সেই শিশুটি হাসিমুখে প্রতিহত করবে। সে পৃথিবীকে স্তনিয়ে গর্ভভবে বলবে, এই আমার দুঃখিনী মা, যিনি আমার জন্মে শত দুখে ও লাঞ্ছনা নীবে ও নতমুখে সহ্য করেছেন। একে সকল অপমান থেকে বক্ষা করা এখন সর্বতোভাবে আমারই কর্তব্য।

দিনেব পব দিন, সপ্তাহেব পব সপ্তাহ এন, মাসেব পব মাস এমনি কবে গড়িয়ে চলল। তুষাব-নবা খোঁড়ো শীতেব দিনগুলিও গত প্রায়। এমন দিনে বেগিণাল গর্ভেব সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। ফুটফুটে একটি ব্যাটাডেলে। এখন যদিও বেগিণাব ঐশ্বর্যেব অভা' নেই তবুও এতে বেগিণা খুসী হয়ে উঠতে পারল না। শিশুটিব দিকে তাকিয়ে তার মন গবে' ভবে উঠল না। তাব মনে হ'ল, কে যেন তাব বক্ষ হিমালীম্পর্শে অসাব কবে দিয়েছে।

প্রত্যহ বেগিণা এই নবজাত শিশুটিকে স্তন্যপান করাত আব লানাল। দিষে আসা শীতেব দিনেব ফা'বাসে আলোতে তাব মুখেব দিকে চেয়ে থাকত। শিশুটি যখন স্তন্যপান কবত তখন বেগিণাব মনে হ'ত যন্ত্রণায় তাব শিবদাড়া বঁকে বঁকে যাচ্ছে। এমনি কবে যতই দিন যেতে লাগল ছেলেটিও ততই একটু একটু করে বড় হয়ে উঠতে লাগল।

একদিন বেগিণা সংবাদ পেলে তাব ম. মা'বা গেছেন। এ সংবাদে বেগিণা খুব বেশী মর্মান্ত হ'ল' না। বোধ হয় আব

অধিক দুঃখ-সহনৈব ক্ষমতা তার অবশিষ্ট ছিল না। ইদানীং আবার বক্তৃদ্দিনের অদর্শনে ও মনের নানা বিরুদ্ধ অবস্থায় স্মৃতিপটে মায়ের মুখখানা যথেষ্ট অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। বেগিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে, এখন আমার নিকৃদ্দিষ্ট সম্ভানটি ছাড়া এ পৃথিবীতে আপনাব জন বলতে আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। এখন তাকে খুঁজে বাব করাই আমার একমাত্র কাজ।

মে মাসেব মাঝামাঝি একদিন বেগিণী তাব নবজাত শিশুটিকে নিয়ে গুটেনবার্গ চলে গেল এবং সেখানকার একজন ডাক্তারের জিম্মায় তাকে বাখবাব সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক কবে ফেললে।

এতদিনে বেগিণী মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবসব পেয়েছে। সমস্ত জমি-জমা বিক্রি করে দিয়ে সে প্রায় দশ লক্ষ ক্রোণাব সংগ্রহ করলে। এখন তাব জীবনে আব একটিমাত্র কাজ বাকী।

একদিন আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য করলে, তাব সুন্দর সোনালী চুলে পাক ধবেছে আর মুখখানাও হয়ে উঠেছে ক্ষয়রোগীব মত ফ্যাকাসে আর বক্তহীন।

আঠারে।

১৮৮০ সালের গ্রীষ্মকালে ফ্রিষ্টিয়ানা সহরের কাগজে কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হল :

“ছ’ বছর আগে, মার্চ মাসে কোন এক দম্পতী এখানকার প্রমুখিসদন থেকে একজন শিশুকে পোস্তপুত্র গ্রহণ করেন। সেই অজ্ঞাত দম্পতীর বর্তমান ঠিকানা সম্বন্ধে যে কেউ এই কাগজের মারফৎ কোন সন্ধান দিতে পারবেন তিনি প্রচুর পুরস্কৃত হবেন। ইতি.....আর্।”

এখন জুন মাস। স্টুডেন্টস্ গ্রোভের ফিকে সবুজ গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে কালো পোষাকপরা একজন মহিলা একাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেলা দুপুর গড়িয়ে এল তবুও তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন না। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর পরিশ্রান্ত হয়ে একটা বেঞ্চিতে তিনি বসে পড়লেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, খাবার বেলা হয়েছে। ভাবলেন, সেই বেলা ছ’টা পর্যন্ত কোন মতে কাটাতেই হবে। ছ’টার পর খববের কাগজের অফিসে যাওয়া এবং খোঁজ নেওয়া—কোন চিঠি-পত্র তাঁর নামে এসেছে কিনা। প্রতিদিন এইভাবে আশা-উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে মন্ডর গতিতে তাঁর দিন কেটে যাচ্ছে।

এইভাবে রেগিণা ধনী বিদেশিনীর মত হোটেলে নিঃসঙ্গ দিন কাটাচ্ছে। হোটেলের বিল হাতে আসতে প্রথম তার

খেয়াল হ'ল, দীর্ঘ একমাস সে এই সহরে একটানা বসে রয়েছে। ধৈর্য ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই। হয়ত একদিন না একদিন সেই বহু-আকাংক্ষিত সংবাদটি এসে যাবে আর যতদিন না তা' আসছে ততদিন তাকে নিঃসঙ্গ গ্রহরা গুণতেই হবে।

যে উকীলটিব ওপর রেগিণার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার ভার, তাঁকে একদিন রেগিণা সব কথা খুলে বললে। তিনিও আশ্রাণ চেষ্টি করতে লাগলেন শিশুটির সন্ধান করতে কিন্তু বিশেষ কোন ফল হ'ল না। তিনি রেগিণাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন, এ যেন অন্ধকাবে ঢিল ছোড়া হচ্ছে। এ ভাবে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে কিনা সে বিষয়ে ঘোবতর সন্দেহ আছে। হয়ত তার ছেলেটি পেবেম্বুলেটারে করে এই সহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাকে চিনবার যো নেই। যদি ধরেই নেওয়া হয় যে ছেলেটি এখনও সেই ধনী পরিবারে পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত হচ্ছে তা'হলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে এতদিনে ছেলেটির ওপর তাঁদের বিশেষ মায়া পড়ে গেছে। তাঁরাই কি ছেলেটিকে সহসা ছেড়ে দিতে রাজী হবেন? আইনের দৃষ্টিতে ছেলেটি এখন তাঁদেরই। কেননা ছেলেটির মা তাকে স্বেচ্ছায় দত্তক দিয়েছে। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করলে এখন অপেক্ষা ও ধৈর্য ধরা ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই। দেখাই যাক, বিজ্ঞাপনের ফল কি দাঁড়ায়! এইসব যুক্তি-সম্ভাবনার কথা ভেবে রেগিণার মন চিন্তাক্রিষ্ট হয়ে পড়ল।

উকীল ভদ্রলোক বহু অনুসন্ধানের পর রেগিণাকে জানানলেন

যে ফ্ল্যাটেনের ভগ্নী দুজনের মধ্যে কেউ-ই কোন দস্তক গ্রহণ করেননি। রেগিণার মনে এতদিন পর্যন্ত যে ক্ষীণ সম্ভাবনার আলো ধিকি ধিকি জ্বলছিল, এই সংবাদে সেই আলোক-বর্তিকা চিরতরে নিৰ্বাপিত হয়ে গেল। প্রতি প্রভাতেই শয্যাভ্যাগ করে বেগিণা দুক দুক কম্পিত বক্ষে ভাবত, আজ বোধ হয় কিছু একটা সন্ধান পাওয়া যাবে কিন্তু প্রতিদিনই তার প্রত্যাশা বার্থ হত। এমনভাবে বৃথা দিন কেটে যেতে লাগল, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটল না।

বেগিণা ভেবে দেখলে, যে সম্পদ সে এত উচ্চমূল্যে করায়ত্ত কবেছে তা’ বুকি কোন কাজে এল না। এতদিন যে বিশ্বাস সে আঁকড়ে ধরে বসেছিল, তার মূল ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। তাব মন ক্রমে ক্রমে ভয় ও অসন্তোষে ভরে উঠল। দৃঢ়তার সঙ্গে রেগিণা তার দুর্বল মনের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করে চলল।

একদিন খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে রেগিণা সন্ধান পেলে যে তার নামে দুখানা চিঠি এসেছে। সে তাড়াতাড়ি চিঠি দু’খানা খুলে ফেললে,—সে দুখানির সঙ্গে যে তার জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে! খুলতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠল।

দু’খানা চিঠির একখানা স্থানান্ত্রাণ্ড ও অপরাধানি রোমস্‌ডাল থেকে এসেছে। দু’জন সংবাদদাতাই জানিয়েছেন যে তাঁরা অজান্তরূপে সেই আকাংক্ষিত দম্পতীর সন্ধান পেয়েছেন।

বহুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে রেগিণা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এই সংবাদে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। চাকুলার আবেগে তার সর্বশরীর ঠকঠক কবে কাঁপতে লাগল। এ ভয় নয়, এ যেন এক অনাস্বাদিত নতুন অমুভূতি। সে অবাক হয়ে ভাবলে, তবে এর নামই কি মুখ? পরিপূর্ণ আনন্দরূপ কি একেই বলে?

কাগজের অফিসের কাউন্টারে বসা মেয়েটির হাতে কয়েকখানা নোট গুঁজে দিয়ে রেগিণা তাড়াতাড়ি হোটেল ফিরে এল। সে তৎক্ষণাৎ জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদাব কাজে লেগে গেল। কোনরকম গোছাপুছিব ঝামেলা না ক'রে সে কোনও প্রকাবে জামাকাপড়গুলিকে বাক্সে ভরে নিলে। পরিশ্রমের আধিক্যে মাঝে মাঝে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে দম নিতে লাগল—থেকে থেকে তার চোখ জলে ভরে এল—অবশেষে ঐখানেই বসে পড়ে সে অদম্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আশ্চর্য হয়ে ভাবলে, তা'হলে অধিক আনন্দেও চোখে জল আসে! এতদিন তাব বুকে যেন এক চাঁই বরফ জমাট বেঁধে ছিল, এতদিনে এক ঝলক দখিনা বাতাসে সেই বরফ গলে গলে পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যায় রেগিণা বার্গেন-গামী স্টীমার চেপে বসল। ক্লোর্ড নদীর ওপর দিয়ে ধীর-মস্থর গতিতে স্টীমার চলেছে। চিম্নি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে গৃহপ্রত্যাগত বিরহীজন যেমন আশা-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রেগিণারও তেমনি মনে হ'তে

লাগল, এতদিন পরে সে বুঝি তার আকাংক্ষিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছে। এখন যেন সে আনন্দহৃদে হাবুডুবু খাচ্ছে। পায়ের নীচে এখন তার শক্ত মাটির স্পর্শ—অত্যন্ত গ্রানিকর জীবনযাত্রা, ছর্ব্ব ছশ্চিন্তা আর তার নাগাল পাবে না। আকাশে যে সোনালী আর রূপোলী রঙের ছবি ফুটে উঠেছে সে তো রেগিণার বর্তমান মানসপ্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি।

সূর্য আকাশের স্বচ্ছ আকাশের রঙান মেঘমালার মধ্যে দিয়ে দ্রুত অস্তগমনে চলেছে। ইতিপূর্বে এমন গৌরবময় অস্তগমন যেন তার ভাগ্যে আর কখনও জোটেনি। রেগিণা সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তার এখনকার অবস্থা ঠিক সেই ভিখারীটির মত যে রাস্তার ফুটপাথে দীনতম ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিলে কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলে যে সে স্বর্গদ্বারে পৌঁছে গেছে। এক অনমুভূত পুলকে বেগিণার অন্তরাঝা যুগ্মুহু রোমাঙ্কিত হতে লাগল। অনাদি কাল থেকেই সে যেন এই স্থল-সাগরে ভেসে আসছে। স্ত্রীমারের বাঁশী পাখীর কুজনের চেয়েও স্মিষ্ট বোধ হচ্ছে। এক উদগত অশ্রুর বন্যা রেগিণার গলা ঠেলে উঠতে লাগল কিন্তু কষ্টে সে তা' দমন করলে।

ক্রিষ্টিয়ানা সহর ক্রমশঃ ফ্লোর্ড নদীর বুকের ওপর ভাসমান কুয়াশা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে। সূর্য এখন পশ্চিম দিগন্তে অবলুপ্ত প্রায়। আকাশের রঙ ক্রমে স্নান হয়ে আসছে। ধূসর সোনালী মেঘগুলি নীলবর্ণ হয়ে আধারে বিলীন হয়ে গেল। স্ত্রীমার সফেন তরঙ্গমালা

অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাঘাতের সময়ও এগিয়ে আসছে। দূরে, দিকচক্রবালের দিকে দেখা যাচ্ছে আলো-ঘরের নিটমিটে হৃদে আলোকশিখাটিকে।

পরদিন প্রভাতে রেগিণা সামান্য বেশ-পরিধান করে একখানা গাড়ী ডাকিয়ে তাতে চড়ে বসল। খ্রিস্টানস্যাণ্ড সহরের সুন্দর ও চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে নির্দিষ্ট ঠিকানার দিকে। ফ্রু লার্স'নেব আস্তানা খুঁজে বের কবতে খুব বেশী বেগ পেতে হ'ল না।

সহরের উপকণ্ঠে একটা কাগজ ও টুপীর দোকানব ভেতরে ফ্রু লার্স'ন বসেছিলেন। ফ্রু লার্স'নেব বয়স হয়েছে, থলথলে মোটা চেহারা এবং মাথাব সব ক'টি চুলই পাকা। দাঁতও অনেককটি পড়ে গেছে। ক্ষুদে চক্চকে চোখ তুলে তিনি রেগিণার দিকে তাকালেন। রেগিণা কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে মনে মনে ভাবলে, কি সবনাশ! এও কি সম্ভব যে আমার ছেলেটি এই ডাইনীটার কাছে মানুষ হচ্ছে এতদিন?

রেগিণার পরিচয় পেয়ে লার্স'ন তাকে সমস্তম্বে দোকানের ভেতরে একটা ছোট্ট অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। নিজেকে তিনি সামনের দোলানে চেয়ারটিতে বসলেন। কোলের ওপর হ' হাত জড়ো ক'রে তিনি নানা বাজে কথায় মশগুল হবার চেষ্টা করলেন প্রথমতঃ। রেগিণা বিরক্ত হয়ে বললে, “আপনি কি আমার ছেলেটির কোন খবর জানেন?”

ফ্লু লার্সন ক্রমাগত ছলতে লাগলেন। তাঁর দেহভারে চেয়ারটা মুহূর্মুহু আর্তনাদ করে উঠল। রেগিণার দিকে কয়েক মুহূর্ত অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তিনি আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন ঠিক কতখানি চাপ মেয়েটির সহনীয় হতে পারে। খুব বিচার-বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হবে, যাতে শিকারটা ফস্কে না যায়। অবশেষে চওড়া থুথুনি নেড়ে তিনি জবাব দিলেন, “আমার পক্ষে এ প্রশ্নেব জবাব দেওয়া কঠিন, কেননা আমি সত্যবদ্ধ আছি এ বিষয়েব বিন্দু-বিসর্গ কারও কাছে প্রকাশ করব না বলে। কিন্তু অসহায়া একজন বিধবাব পক্ষে প্রলোভন দমন কবা তো আর সহজ নয়!”

বেগিণা আবেগ-কম্পিত বক্ষে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “আমার খুবই তাড়া আছে, অনুগ্রহ করে যা’ জানেন শীঘ্র বলুন। যত টাকা চান আমি দিতে প্রস্তুত।”

ফ্লু লার্সন করুণ ভাবে তাঁর দোকানটির দুর্দশার কথা বিবৃত ক’বে চললেন। কে একজন বিদেশী পাওনাদার নাকি তার নামে নালিশ কববে বলে ভয় দেখাচ্ছে। তা’ হলে তাঁব সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবে তাই বোধ হয় ঈশ্ববেব অভিপ্রায়, নইলে তাঁরই বা কপাল ভাঙবে কেন? অথচ মজা এই যে, সেই ভগবানই আজ রেগিণাকে তাঁব উদ্ধারকত্রী হিসেবে পাঠিয়েছেন। কাণ প্রার্থনা করতে তো তাঁব একদিনও ভুল হয় না ইত্যাদি। এইভাবে অজস্র কথা বলতে বলতে ফ্লু লার্সন কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

রেগিণা রাগে জ্বল উঠল, “কতো টাকা চায় আপনার? আমার কাছে এখন খুব বেশী নগদ টাকা নেই, কিন্তু যদি আমাব ছেলেটির সঠিক সংবাদ পাই, তা’হলে প্রচুর পুরস্কার দেবো আপনাকে।”

“একটা লোকের কাছে আমার পাঁচ হাজার ফ্রোণার ধার আছে। অবশ্য এ টাকাটা আমি ধার বলেই নেবো...আপনি যদি...”

বেগিণা চেক লিখতে লাগল। ফ্লু লাসর্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শাস্ত্র ভালমাহুঘটির মতন জলজ্বল ক’রে তাকিয়ে দেখছেন। লেখা হয়ে গেলে চেকখানা তাঁর হাতে দিয়ে রেগিণা বললে, “এইবাব বলুন—আর সময় নষ্ট করবেন না।”

ফ্লু লাসন চেকখানা হাতে দিয়ে সেখানা সময়ে ভাঁজ করে হাতে রেখে অশ্রুসিক্ত চোখে রেগিণাকে তার এই উপকারের জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিতে শুরু করতেই রেগিণা চীৎকার করে উঠল, “আর যদি বাজে কথা বলেন তা’হলে চেকখানা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলব।”

এতক্ষণে ওষুধ ধরল। লাসন বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আরম্ভ করলেন, “সত্যিকথা বলতে কি, লোকটি আমার সহোদর ভাই—রাস্তার ওপাশে তার নিজের দোকান আছে। আমার বলা উচিত হচ্ছে না তবে লোকটা বজ্রাতের ধাড়ি। শিশুটির ভবিষ্যৎ ভেবেই আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি নইলে এ কথা আমি মরে গেলেও

প্রকাশ করতাম না কোনদিন। অবশ্য আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হলে যে আমার নাম আপনি কাহারও কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।”

রেগিণা রুদ্ধশ্বাসে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল। ঠিকানাটা পেতেই সে উদ্বিগ্নস্বাসে সে স্থান পরিত্যাগ করলো।

নির্ধারিত ঠিকানায় পৌঁছে রেগিণা বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাব ভয় হ'ল বুঝি বা উদ্ভেক্তনার আক্ষেপে তার বুকটা এখুনি ফেটে পড়বে। পরমুহূর্তেই সে দরজা ঠেলে ভেতবে ঢুকে দেখলে একজন জ্বালোক একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কতকগুলো পোষাক গুছিয়ে তুলছে আর একটি শিশু মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে।

রেগিণা কিছুক্ষণ শিশুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, তারপর অক্ষুণ্ণস্বরে কি কয়েকটি কথা বলে, তাকে সাপটে বুকে জড়িয়ে ধরে অস্বাভাবিক হাসিতে ফেটে পড়ল। উদ্ভাদিনী জ্বালোকের মত সর্বাঙ্গ কাপিয়ে সে হেসেই চলল। শিশুটির মাথা, মুখ, চুল—সর্বাঙ্গ সে অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিলে। যুগী-রোগীর মত হাসতে হাসতে তার দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু নেমে এল। এইসব দেখে শুনে শিশুটি ককিয়ে কেঁদে উঠল।

যে জ্বালোকটি কাপড় গুছিয়ে তুলছিল সে কাজ ফেলে ছুটে এসে রেগিণার হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে বললে, “বলি

তোমার কাণ্ডটা কি ? ছেলেমানুষকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন ? এ কি পাগলামী !”

বেগিণা ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে আবার হেসে উঠল, “ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি ! এ আমার ছেলে !”

“তোমার ছেলে ? তোমাব কি মাথা খারাপ ? ভাল চাও ত ফিরে দাও বলছি ! দেখছনা বাছা আমাব ভয়ে কি রকম ককিয়ে উঠেছে !”

• রেগিণা শিশুটিকে আরও সাপটে ধরে বললে, “কেন দেব ? এ ছেলে আমার । কি নাম বেখেছ ওব ? ওলাফ্ ?”

জীলোকটির এতক্ষণে স্থিৰ ধারণা হ’ল মেয়েটির নিশ্চয়ই মাথা খারাপ । সে থিঁচিয়ে উঠে বললে, “তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ ?—দেখছনা ও মেয়ে, ছেলে নয়, ওব নাম ইন্গা ।”

রেগিণা পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে গেল । সে কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটিকে ধপাস্ করে মাটিতে নামিয়ে দিলে । তাবপব যেন অনেকটা বিকারগ্রস্ত কগীর মত ঘব থেকে আস্তে আস্তে বেবিয়ে গেল ।

উনিশ

মধ্যরাত্ৰিতে রেগিণা হোটেলে ফিরে এল। এতক্ষণ সে একটা পার্কের বেঞ্চিতে নিঝুম অবস্থায় বসে ছিল। কিছুক্ষণ আগে বেশ এক পশলা রুষ্টি হয়ে গেছে, গাছের পাতাগুলিতে মুক্তোর মত জল টলটল করেছে এবং বাস্তাঘাট ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে। একটা ক্ষীণ বাষ্পবেখা আদ্র জনপদ থেকে আকাশপানে ঠেলে উঠছে।

সেই কঠোর আঘাতের ধাক্কা বেগিণা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। হোটেলে ফিরে গিয়ে সে বেশ কিছুক্ষণ মুহূর্তমানের মত বিছানায় পড়ে বহল কিন্তু বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে তাব সাহস হ'ল না। তাব মনে হ'ল একটা কালো ছায়া যেন গাঢ় অন্ধকারের বুক চিবে তাব দিকে ছুটে আসছে। ক্ষণিক দুর্বলতার স্রোতে সেই ছায়া তাব ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। জ্ঞান হারালে চলবে না, তাকে সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। ধৈর্য হাবালে চলবে না, এখনও সব কিছু আশা শেষ হয়ে যায়নি! আরও একখানি চিঠি তাব হাতে আছে। এখনি সাহস হাবালে চলবে না!

আরও একটি রাত্ৰি বেগিণা সেই অচেনা সহবে, অপবিচিত্র একটা হোটেলের কামরায় অসহিষ্ণুভাবে কাটিয়ে দিলে। খুব ভোরে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বোধ হয় সূর্য সেদিন সকাল সকাল উঠেছিল কিম্বা মাছির ভ্যানভানানী হয়ে

উঠেছিল অসহনীয় কিস্বা রোমসডাল সহর সর্বদা তার মাথায় ঘুরছিল। কারণ যাই হোক, সারারাত্রি তার ভাল ঘুম হয়নি। এখন মাথাটা অসম্ভব দপ্‌দপ্‌ করছে আর চোখের পাতা বুঁজে বুঁজে আসতে চাইছে। উত্তপ্ত চক্ষুগলের ওপর নৃত্যশীলা মরোচিকার মত নানা উদ্ভট দৃশ্যাবলী তার চোখের সামনে ভেসে আসছে। সে অমুভব করলে, হাত-পায়ের পাতাগুলি ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে।

সেই কৃষ্ণবর্ণ ছায়াটি তাকে গ্রাস করতে ছর্ব্বার বেগে ছুটে আসছে। এখন মাঝপথে সে যদি এই ব্যর্থ পরিক্রমা পরিত্যাগ ক'রে মুষড়ে পড়ে, তাহলে সেই কৃষ্ণ ছায়া তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলবে। এখন সাহস ও বল হারালে চগবে না। এখন তার একমাত্র কর্তব্য সামনে এগিয়ে চলা, পিছন ফিরে তাকালেই সর্বনাশ !

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হ'ল। প্রবল উত্তেজনার কল্যাণে সমুদ্র-পীড়াকে রেগিণী গ্রাহের মধ্যেই আনলে না। আজ সমস্ত রাত্রি হয়ত সমুদ্র অশান্ত থাকবে কিন্তু কাল, সকালেই তারা বার্গেন পৌঁছে যাবে এবং তারপর বহুক্ষণ ধরে তারা পাবে পবত-মালাবেষ্টিত শাস্ত্র জলপথ। দূরে কাল কাল আকাশচুম্বী সু-উচ্চ পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে জেলেদের ছোট ছোট কুটিরগুলি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মনে হয় সূর্যালোক কোনদিনই সেই সব কুটিরে প্রবেশ লাভ করেনি। পাহাড়ের গায়ে একটা

জেলে নৌকো বাঁধা রয়েছে। এই সব দৃশ্য অতিক্রম করে ষ্টীমার ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে চলল।

রেগিণা একটা ছোট আঁট টুপী মাথায় দিয়ে ডেকে বসে আছে। বাতাসে তাব জামার কলার উড়ছে। বাইবেল নিরানন্দ অঙ্ককার তার ভেতরেও খানিকটা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তার মন কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো চিন্তায় ডুবে গেল।

মোন্টে-বে তে তাদের ষ্টীমার পড়তেই আবহাওয়া বদলে গেল। এখন দীপ্ত সূর্যালোকে দিক্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর নবজন্ম হ'ল যেন। যাত্রীরা সব ডেকের রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে উজ্জ্বল প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন হাসিব ঝলকে উছলে পড়ে তটে ভেঙ্গে পড়ছে। তীরের সবুজ বনানীর বৃকে চোখ জুড়োনো স্নিগ্ধতা। তুষার-মণ্ডিত পর্বতের চূড়াগুলি নির্মল আকাশের বৃকে ঝলমল করছে। সমুদ্রের সফেন তরঙ্গমালা পাহাড়ের বৃকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আধখানা পাহাড়কে মুহূর্তেব জল গ্রাস করে ফেলছে। ফার ও অন্তান্ণ বৃক্ষে সমাকীর্ণ দূরের উপত্যকাভূমির উর্বরা জমিগুলি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। দেখতে দেখতে ছোট সहरটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সুন্দর সুসজ্জিত সहर। যেন সাজানো বাগানের মধ্যে কতকগুলি সুদৃশ্য বাড়ী বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সুন্দর আবহাওয়া ও নয়নাভিরাম দৃশ্যে বেগিণার মনের প্রফুল্লতা অনেকটা ফিরে এল।

সেইদিন নিকলে রেগিণা অপর পত্রখেরকটির উদ্দেশ্যে

বেরিয়ে পড়ল। বহু রাস্তাঘাট পেরিয়ে একটা বড় গোলাবাড়ীর সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বড় সাদা রঙের বাড়ী, লাল টালি-চাওয়া বৃহৎ গো-শালা ও সুসজ্জিত বাগান দেখে মনে হয় গৃহস্থামীর অবস্থা ভালই। বাড়ীর মালিক উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যমদূতের মত চেহারা, মুখে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঘন কালো চুলের ওপর একটা চোঙাওয়ালা টুপী বসান। পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে তিনি পাইপ টানছিলেন। বিরক্তিপূর্ণ চোখে তিনি একবার আগন্তকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তারপর এগিয়ে এসে টুপী তুলে অভিবাদন জানালেন।

রেগিণা পবিচয় দিতেই তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি রেগিণাকে পথ দেখিয়ে একটা বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ঘবটার নতুন কলি ফেরান হয়েছে। রেগিণা বসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জ্ঞে এক কাপ গবম দুধ এল। লোকটি কাসতে কাসতে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

দুখটা কোন রকমে গলাধঃকরণ করে গৃহস্থামীর দিকে রেগিণা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে। লোকটি সেখানকার নতুন জেলা-শাসকের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করতেই রেগিণা তাঁকে চেনেনা বলায় তিনি বেজায় উৎসাহেব সঙ্গে তাঁর নিন্দেবাদে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। স্বাধীনজীবী শাস্ত্র চাষীদের ওপর লোকটা নাকি বেজায় খাপ্পা - অত্যন্ত কদর্য ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে। একটানা এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে লোকটি একবার

আড়চোখে দেখে নিলেন রেগিণার ওপর তাঁর বক্তৃতাটিবু
কি রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

কিছুটা সৌজ্ঞেয়র খাতিরে রেগিণা এইবার মন্তব্য করলে,
“তাই নাকি? লোকটা তা’হলে ভারা অভদ্র ত!”

রেগিণার সমর্থনসূচক উক্তিতে লোকটি উৎসাহের সঙ্গে
আবার একচোট গালি-গালাজ শুরু করে দিলেন।

বেগিণা আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। সে বাধ্য হয়ে এই
বক্তৃতাশ্রোতে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কবলে, “আপনি কি এরই
কথা চিঠিতে লিখেছিলেন? হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা
কোন ডেলেকে তিনি দত্তক নিয়েছেন কি না বলতে পারেন?”

“সেটা অবশ্য সঠিক জানিনা। তবে...”

বেগিণা বুঝল এ বিষয়ে আর তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসাবাদ
কবা বুধা! সে উঠে পড়ল। লোকটি তার পেছনে পেছনে
বাইরে এসে অদূরের একটা বাড়ী দেখিয়ে বললেন “এঁটা তার
বাড়ী।” তারপব রেগিণাকে বিদায় দেবাব পূবে আর একবার
মনে করিয়ে দিলেন, “লোকটা কিন্তু বেজায় ধড়িঝাজ। একবার
যদি আইনের প্যাঁচে তাকে পান, খবদাঁব কিছুতেই রফা
করবেন না যেন—একেবারে কসে তা’র রস নিঙরে নেবেন।”
এই কথা বলে তিনি ফ্যা ফ্যা করে হাসতে হাসতে রেগিণাকে
বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন।

রেগিণার মন দমে গেল। এ কি বিপদেই না সে পড়ল!
ক্রিষ্টানস্যাণ্ড-এর সেই বুড়ী চেয়েছিল তার কাছ থেকে কিছু

টাকা ঠকিয়ে নিতে। এই সুযোগে যদি তার ভাইকে কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়—তাও বোধ হয় বুড়ীর প্রচ্ছন্ন বাসনা ছিল। খুব স্পষ্টভাবে বুড়ীর উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কিন্তু এই লোকটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হয়ত জেলা-শাসকের ওপর তাঁর বিলক্ষণ রাগ আছে তাই তাঁকে অহেতুক হয়রাণ করবার জন্তে একটা আজগুবি আঁষাঢ়ে গল্প বানিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে যাওয়া নিরর্থক হবে না কি? কিন্তু রেগিণী শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলে, যখন অশ্রু কিছু করণীয় নেই তখন একবার ওখানে নেড়ে-চেড়ে দেখতে ক্ষতিই বা কি?

রেগিণী যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় পৌঁছল তখন তাব রীতিমত পা কাঁপছে। তার ভয় হ'তে লাগল, এখানেও যদি সে হতাশ হয়। তবুও আশায় বুক বেঁধে সে কলিং বেল টিপলে।

সাদা টুপি পরা একজন বৃদ্ধা এসে দবজা খুলে দিলেন। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বেগিণী তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কাছেই আশ্রয় নেবার মত কোন আস্তানার খোঁজ তাঁব জানা আছে কি না!

বৃদ্ধাটি অবাক হয়ে রেগিণীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাকে ভেতরে এসে বসতে অনুরোধ করলেন। তিনি তাকে নিয়ে এসে একটা প্রশস্ত হলঘরে বসালেন। উভয়ের পরিচয়-বিনিময়ের পর মহিলাটি কতকগুলি বোডিং হাউসের ঠিকানা দিয়ে জানালেন, সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে এসব আবাসগুলি গ্রীষ্মকালে অতিথিদের আশ্রয় দিয়ে থাকে।

রেগিণা সে সম্বন্ধে বিশদভাবে খোঁজখবর নিতে লাগল। কিন্তু তার চিন্তা, কি ভাবে আসল কথাটা স্মরণ করা যায়। ভদ্রমহিলার মধুর ব্যবহারে তার সাহস হ'ল। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ ক'রে তার বেজায় লজ্জা করতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল, মহিলাটির গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে সব কথা খুলে বলে। কিন্তু সে সংকল্প তার ব্যর্থ হ'ল, কেননা, কপাল টিপে ধরে অশ্রুধাকর্ণে বৃদ্ধা বললেন, “আমাকে আজ কিন্তু মাপ করতে হবে—আজ আমি বড়ই ক্লান্ত।”

উপ্তিতটা খুবই সুস্পষ্ট। বেগিণা উঠি উঠি করছে এমন সময় মহিলাটি আবার বললেন, “কাল আমাদের সারারাত্তি বিনিদ্র অবস্থায় কেটেছে কিনা!”

রেগিণা রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, “বিশেষ কোন কাজ ছিল বুঝি?”

মহিলাটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “আমাদের বাড়ীতে একটি ছোট্ট খোকা ছিল—ছেলেটি কাল আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেল” এই বলে মহিলাটি তাঁর সিন্ধের ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলেন।

বহুদিনের অভ্যাসের দরুণ রেগিণার ধৈর্যধারণের এক সহজাত ক্ষমতা এসে গিয়েছিল। সে যথাসম্ভব মানসিক উত্তেজনা দমন করে জিজ্ঞাসা করল, “ছেলেটি কি আপনার নাতি?”

“না, তেমন কোন আত্মীয় নয়, তবে...”

রেগিণা হঠাৎ করমর্দনের জন্তে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে

দিয়ে বলে উঠল, “আমি এ দুর্ঘটনার কথা জানতাম না, জানলে এ বিপদে আপনাদের কোন মতেই বিরক্ত করতে আসতাম না।”

যাবার জন্তে রেগিণা পা বাড়াল, কিন্তু ছ’ এক পা এগিয়েই পুনরায় ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, “ছেলেটির কত বয়েস হয়েছিল?”

“সবে ছ’ বছরে পড়েছিল।”

“ছেলেটিকে কি আপনি দত্তক নিয়েছিলেন?”

রেগিণা এইবার শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। এইবাব বুঝি সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। মহিলাটি বললেন, “জা, ঠিক ছ’ বছর আগে একটি প্রসূতিসদন থেকে এক বকম কুড়িয়ে এনেছিলাম তাকে। আমাদেরই একজন হাউসকিপার ক্রিস্টিয়ানায় গিয়ে— কিন্তু যাক সে সব কথা।”

রেগিণা এতক্ষণ হাঁ কবে মহিলাটির কথাগুলো গিলছিল। শেষের কথাটিতে তার প্রাণ ফিরে এল। মনে মনে বললে, ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ! আমার ছেলেটি তা’ হলে নয়। প্রকাশ্যে বললে, “আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বিদায়!”

সন্ধ্যার পর রেগিণা হোটেলের বাবান্দায় বসে দু’ বনানী’ব দিকে চেয়ে ছিল। হোটেলের খানা-কামরা থেকে হৈ-হল্লা, গাল-গল্লের ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরো ভেসে আসছে। বোর্ডাররা বিভিন্ন ভাষায় গল্প জুড়ে দিয়েছেন। তাঁরা আনন্দ করছেন,

খানা-পিনা করছেন। রাত্রেও তাঁদের সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত হবে না। তাঁদের বৃকে তো আর ভারী, টনটনে বেদনা চেপে বসে নি!

কিন্তু হাউস্‌কিপারের গল্পটা কি বানানো? যদি তাই হয়, রেগিণা এখুনি পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত পঙ্গু হয়ে শুয়ে পড়বে—কোথাও ছুটে পালাবার শক্তি পর্যন্ত তাব অবশিষ্ট থাকবে না। এতদিন পর্যন্ত যে অশুভ ছায়া তাকে সর্বদা অনুসরণ ক’রে ফিরছে সেই ছায়া তাকে গ্রাস কবে ফেলবে। রেগিণা মনকে দৃঢ় কবে ভাবতে চেষ্টা করলে, না, না, আমার সম্ভানটি নিশ্চয়ই জীবিত আছে আর ঐ যে ছেলেটি মারা গেছে এটি তাঁদের হাউস্‌কিপারের। বৃদ্ধা মহিলাটি কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না। ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনও তার ঘুরে বেড়াবার শক্তি আছে, এখনও তার টংকাব সাজ্জল্য আছে। চলতি পথে হয়ত বহুবার পায়ে কাঁটা ফুটবে—কিন্তু তা’তে ভয় পেলে চলবে না। এই কুচ্ছ সাধনের পথে যদি তার কিছু পাপ ধুয়ে-মুছে যায়!

কিন্তু অতঃপর কোথায় যাবে সে? যদি পরামর্শ দেবার মত একজন বন্ধুও থাকত তার! তার সমস্ত সামাজিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই বিশাল ও হিংসাত্মক পৃথিবীতে সে নিতান্তই একা! মনের চিন্তা প্রকাশ করবার উপায় নেয়, সাহসনা দেয় এমন বন্ধু নেই। সত্য পথের সন্ধান সে কি কোন দিনই পাবে না?

মধ্যবাত্রি পর্যন্ত বেগিণা সেই বারান্দাটিতে নিশ্চলেব মত বসে রইল। অত্যাশ্চর্য সবাই শুয়ে পড়েছে। সহরের কোলাহল এখন শাস্ত হয়ে এসেছে। তটপ্লাবী নদীব শব্দ এত দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বাত্রি যেন দিনেব মত হাল্কা। লঘু মেঘখণ্ডগুলি এখনও শুক্ল আকাশকে ক্ষীণভাবে আলোকিত কবে রেখেছে।

ইতিপূর্বে ক্রিষ্টানস্যাণ্ড্ থেকে রেগিণা টেলিগ্রাম কবে নির্দেশ দিয়েছিল, খবরেব কাগজের অফিস থেকে যেন তার চিঠিগুলি মোল্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পবদিন প্রত্নাবে পোষ্টঅফিসে গিয়ে দেখল, তাব নামে আরও হু'খানা চিঠি এসে গেছে।

কুড়ি

সেই দু'খানা চিঠির সূত্র ধরে বেগিণী প্রথমে ট্রান্ডজেম ও পরে নর্ডল্যাণ্ড-এ ছুটে গেল। আবার সে আশায় উদ্দীপিত হয়ে উঠল। আবার যে আশা করতে সাহস হচ্ছে এতে সে খুসীই হয়ে উঠল। কিন্তু আশাভঙ্গ হতে আবার নতুন করে সে ভেঙ্গে পড়ল।...নর্ডল্যাণ্ড-এর চিঠিটায় হয়ত কিছু কাজ হলেও হতে পারে ভেবে আবার তার বকে বল ফিরে এল। তাব সন্দেহ হতে লাগল তাব দাকাব এর মধ্যে কিছুটা হাত থাকলেও থাকতে পারে। বকে নতুন আশা নিয়ে সে উত্তরনুখো ছুটে চলল। এবারও সে অকৃতকার্য হ'ল বটে কিন্তু নতুন একটা সূত্র পেয়ে তার মনে হ'ল তার কষ্ট সার্থক হয়েছে। সে ভাবলে, দেখা যাক এবাব সন্ধান মেলে কিনা!

এখন থেকে রেগিণীর এক অদ্ভুত জীবন শুরু হ'ল। কোথাও স্থির হয়ে বসবার উপাই নেই, সবদা তার জীবন কাটে পথে পথে। ক্রমান্বয়ে আশা আর হতাশার পবম্পর-বিবোধী স্রোতে গা ভাসিয়ে তার দিন কেটে যায়। মনে করে এইবার শেষ, আর তাকে ধাক্কা খেতে হবে না। কিন্তু প্রতিবারই অসাফল্যের গ্লানিতে ত'ার জীবন ভরে ওঠে। বিশ্বাসের তোয়াক্কা না করে পুনরায় উদ্দাম গতিতে সে তাব শঙ্কিত পরিক্রমা শুরু করে দেয়।

হেমন্তের শেষে একদিন সে খোঁজ পেলে একজন ডাক্তার নাকি একটি পোগ্রাপুত্র নিয়েছেন। হৃদে পাতাওয়ালা গাছের

কাঁক দিয়ে আর গো-চারণ ভূমি ও শস্যভূমির পাশ দিয়ে বহে যাওয়া একটি ছোট্ট নদীর পাশ দিয়ে সে চলেছে। রাস্তায় যখন বরফ পড়ছে তখন সে চলেছে স্নেজ্ গাড়ী করে টোটেন সহরের ওপর দিয়ে। কে একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়।

রেগিগার খারণা হ'ল সকলেই তার পরিক্রমার আসল উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছেন এবং সর্বদাই তার কাছে সত্য গোপন করে চলেছেন। যাঁরা তার ছেলেকে মানুষ কবছেন তাঁরা সযত্নে সমস্ত তথ্য তার কাছ থেকে গোপন করতে চেষ্টা কবছেন এমনকি ইচ্ছে করে আক্রোশবশে তাকে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। যতই এ খারণা তার মনে বদ্ধমূল হ'ল ততই সে নিষ্ফল আক্রোশে সেই সব লোককে ক্রমাগত খুঁজে বেড়াতে লাগল, যাঁরা তার সারা জীবনটাকে ব্যর্থতায় ভরিয়ে দিয়েছে। কত দিন যে সে বিশ্বাসের মুখ দেখেনি মনেই পড়ে না।

বড়দিনের পর আবার সে ট্রেনে চেপে চলেছে ওস্টারডালের ভেতর দিয়ে। গাছের চিক্চিকে ডাল-পালার দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। এটর্নির সঙ্গে অবিলম্বে তার দেখা করা দরকার।

এতদিন রেগিগা তার গুপ্ত বেদনার কথা নিজের মনে চেপে রেখেছিল। এবার সেই গুপ্ত কাহিনী সে সবত্র বলে বেড়াতে লাগল, একে, ওকে, তাকে। দেখাই যাক না, তাতে যদি কিছু উপকার হয়! সে যথেষ্টভাবে জলের মত টাকা ব্যয় ক'রে, এ এটর্নি, সে এটর্নিকে নিযুক্ত করতে লাগল। যখনই তার

কানে এল অমুক এটর্নির বেশ নাম-ডাক আছে, অমনি সে দৌড়ে তার কাছে গেল। তাঁরা সকলেই প্রসূতি-সদনে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন কিন্তু তাতে কিছুই ফল হলনা কেননা সেখানকার বই-পত্র থেকে কোন হৃদিশ পাওয়া গেল না। প্রফেসরই একা সমস্ত জানতেন। রেগিণা নিজেও বলতে পারল না, ছেলেটির কি নাম, ছেলেটিকে যঁরা দত্তক নিয়েছেন তাঁদেরই বা কি নাম বা বাড়ী কোথায়। এমনকি তাঁদের বাড়ী নরওয়েতে না আর কোথাও সে সম্বন্ধেও সে কোন আভাস দিতে পারল না।

এটর্নিরা সবাই তাকে পবামর্শ দিলেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে। কিন্তু কতকাল আর সে ধৈর্য ধরে থাকবে? কে জানে আর কতদিন তার আয়ু! সুতরাং অনতিবিলম্বেই তার ছেলেটির সন্ধান পাওয়া দরকার। অবশেষে সে প্রতিজ্ঞা করলে, আব কারও ওপর নির্ভর না করে সে নিজেই একবার শেষ চেষ্টা কবে দেখবে। সে আবও যদি সতর্ক হয়, তাহলে একদিন না একদিন সে তাব ছেলেকে খুঁজে পাবেই পাবে।

একদিন তার হাসপাতালের বিগত দিনগুলির ক্ষীণ স্মৃতি মনে ভেসে উঠল। ঠিক! ঠিক!! একদিন হাসপাতালে থাকতে হঠাৎ জেগে উঠে সে যেন প্রফেসরের সঙ্গে ছ'জন অপরিচিত ব্যক্তিকে ঘরের মধ্যে দেখেছিল। তাঁরা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁরা তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু

কেমন যেন দেখতে তাঁদের ? সে বহু চেষ্টা করেও তাঁদের মূখ মনে করতে পাবল না। এইটাই একমাত্র সূত্র। যদি সে তাদের চেহারাটা একবার মনে করতে পারত ! ঘরেব সে দিনের দৃশ্যটা মনেব মধ্যে ফুটিয়ে তুলবার জ্ঞে সে প্রাণপণ চেষ্টা কবতে লাগল। সে ভদ্রলোকটির নাক, দাড়ি, জামাকাপড়, চুল ইত্যাদি কেমন মনে করতে চেষ্টা করল। তার মনে হল পুরুষ মানুষটির চেহারাটা সে যেন কিছু কিছু মনে করতে পারছে। আরও কিছুক্ষণ পরে তাব ধ্রুব বিশ্বাস হ'ল ভদ্রমহিলাটিকেও সে ছবছ মনে কবতে পারছে। এখন দুজনকেই সে স্পষ্ট চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাঁদের ? এখন একমাত্র প্রয়োজন তাঁদের খুঁজে বার করা। আর সে তা' কবনেই, যেমন কবে হ'ক। এখন সে যখন তাঁদের ছবছ বর্ণনা দিতে পাবে তখন তাঁদের খুঁজে বাব করাটা আর তত কঠিন হবে না।

তারপর থেকে সে এমন সব লোকেব সংস্পর্শে আসতে লাগল যারা এই সুযোগে বেশ ছ' পয়সা কামিয়ে নিল। বেগিণা যেন ইচ্ছে করেই তাদের ফাঁদে ধরা দিতে লাগল। সামান্য একটা আশার পেছনে সে অজস্র অর্থ ব্যয় করে ফেললে যদিও তার ধ্রুব ধারণা হোল যে সবাই তাকে ঠকিয়ে নিচ্ছে। খুঁজে বেড়াবাব যে আর একটা নতুন সূত্র পাওয়া গেল এতেই সে খুসী। এই নতুন সম্ভাবনাগুলি যেন তার নির্বাপিত প্রায় ক্ষুদ্র প্রদীপটিতে কয়েক ফোঁটা তৈলদানের মত কাজ ক'রে তার আশার

শ্রদীপটিকে পুনরায় শ্রদীপ্ত আলোকশিখা বিকীরণে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগল।

এইভাবে সপ্তাহ ও মাসগুলি দ্রুত কেটে যেতে লাগল। প্রতিবারের অসাফল্যের জন্তু তাব মুখে নতুন নতুন কুক্ষিত রেখার সমাবেশ হ'তে লাগল। তা'র একদা কৃষ্ণবর্ণ, কুক্ষিত কেশদাম সাদা সাদা টানায় ভরে উঠল। ক্রমশঃ তা'র বয়স অনুমান করা এক শত্রু ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সে বুঝা কি যুবর্তী তা' নিকপণ কবা যেন প্রায় অসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

এখন থেকে সে যা কিছু দেখত ও যা কিছু শুনত সবই সেই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। পৃথিবীতে ঐ ছ'টি ক্রিয়া ছাড়া আব কোন কিছুব যেন অস্তিত্ব নেই।.....ট্রেনেব কামরায় দু'জন লোকের সাধাবণ কথাবার্তা থেকে সে নতুন নতুন সূত্র খুঁজে বার করতে চেষ্টা করত। যেখানেই সে যেত, যাকেই সে দেখত—সবই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করত। সর্বদা আশা করত, এই বার বোধ হয় সে সেট ছুটি প্রাণীব সন্ধান পাবে। এতদিনে তাঁরা দুজনে তার মানস চক্রে অতি-পরিচিত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন।...কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই তাব মনে হতে লাগল এই বার সে খাড়া পাহাড়ের ঠিক প্রান্তদেগে এসে পৌঁছেছে। আর সম্মুখে দেহ প্রসারিত করবার কোন উপায় নেই। এখন আব স্বীকাব না কবে উপায় নেই যে সে একজন নিরপরাধীকে অনর্থক হত্যা করেছে.....।

এমনি অবস্থায় একদিন রেগিণা তার ষ্টেটের উকীলের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল। তিনি জানিয়েছেন যে ফ্ল্যাটেনের বোনের সম্পত্তি বিভাগেব প্রশ্ন তুলেছেন এবং প্রস্তাব করেছেন যে রেগিণা যাতে তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে না পারে তার জন্য ফ্ল্যাটেনের পুত্রের তরফ হতে তাঁরা এখুনি সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে নিতে চান। সে দিক থেকে পাছে কোন গণ্ডগোল ওঠে এই ভয়ে রেগিণা তাঁদেব প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। কিন্তু তার মনে হতে লাগল এইবার ঝড়েব পূর্বসূচনা সুরু হল। ফ্ল্যাটেনেব পুত্রের দিক থেকে এ যেন প্রথম স্বাধীন প্রতিবাদ। ছেলেটিব বয়েস বাড়ছে। আব দেবরী নেই। এইবার সে একদিন এসে পড়ল বলে! একদিন না একদিন সে আসবেই তার পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে। সে দিন আর খুব দূরে নেই! এর মধ্যেই যা' হোক কিছু একটা করা দরকাব!

একুশ

এমনি ভাবে দিন যায় আব আসে।

একদিন বেগিণা হোটেলের স্ন্যাসনেসে বিছানায় শুয়ে ঠক্ ঠক্ কবে কাঁপছে আব বাইবেব অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। সে যেন অধ-ঘুম ও অধ-জাগরণের মধ্যে অবস্থান করছে। কখনো সে ষ্টীমারে চড়ে চলেছে, কিন্তু ষ্টীমার খুব আস্তে আস্তে চলেছে। আবাব কখনও ট্রেনে চেপে চলেছে কিন্তু ট্রেন শ্লথ-মস্তব গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। এবাব আব ট্রেনে চেপে নয়, সে চলেছে পায়ে হেঁটে। যতই সে ছুটতে চাচ্ছে ততই তাব পা জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।...পরমুহর্তেই সে ছুটে চলেছে এক জলাভূমির ওপর দিকে। তাব মাথাব ওপরের ঝটিকা-বিজুন্ধ আকাশ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কেবল মাত্র ঈষৎ হলদে আলোকে স্বল্প আলোকিত। ঘন ঝালো মেঘ যেন পবম্পব পবম্পবকে ভীষণ আক্রোশে তাড়া করছে। আব বেগিণা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটাব প্রতিকূলে ছুটে চলেছে। হঠাৎ পেছন থেকে পদশব্দেব আওয়াজ তা'ব কানে ভেসে এলো। এ পদশব্দ তা'ব অপবিচিত নয়। সে আবও জোবে ছুটে চলেছে। পেছন ফিরে তাকাতে সাহস হচ্ছে না কিন্তু সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, প্রকাণ্ড বড় একটি মুখ, ধূসর এক জোড়া গৌরব এবং শান্ত একজোড়া চোখ। সে তাব কোন ক্ষতি করতে চায় না। কেবল বলতে চায়, 'আমি তোমাকে ক্ষমা

কবেছি'। চাঁৎকাব ক'বে বলছে, “প্রিয়তমা পত্নী আশার,—অত ছুটোনা, একটুখানি অপেক্ষা করো, আমি কেবল তোমাকে বাবেক চুম্বন ক'বে বলতে চাই, আমি তোমাব সমস্ত অপবোধ ক্ষমা কবেছি। একথা ঠিক যে আমি সাবান্ধীবন কঠোব পবিশ্রম ক'বে যে অর্থ সঞ্চয় কবেছি, তা হুমি হাওয়ায উড়িয়ে দিচ্ছ। কিন্তু তা'তে আমি ক্ষুব্ধ নই। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না যে আমি তোমাকে ক্ষমা কবেছি?”...

কিন্তু বেগিণী ছুটে চলেছে তো চলেছেই। যেমন কবে হোক সেই শ্রেতধ্বনি থেকে মুক্ত হওয়া চাই। তাব মাথাব ওপব দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল। যাঁদেব সে চোখেব সামনে দেখছে তাঁরা কেউ কেউ বা মৃদু সস্নেহ-স্ববে কথা বলছেন, কেউ না বক্তরাঙা চোখ দেখিয়ে চাঁৎকাব ক'বে ভৎসনা কবছেন। একবাব যদি সে থেমে পড়ে, তাঁবা তাব ওপবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। স্তুতবাং বিশ্বাস নয়, তাকে অবিশ্রাস্ত ছুটেতে হবে। কিন্তু যতই সে ছুটেতে চেষ্টা করছে ততই তার পা জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে। শত চেষ্টাতেও সে এক পাও এগুতে পাবছে না।... ..

হঠাৎ রেগিণী চম্কে উঠে বিছানা হেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটা বাতি জ্বলে নিয়ে সে অনেকক্ষণ ধবে খাটেব প্রান্তে চুপচাপ বসে রইল।

—ওঃ, এতক্ষণ আমি তাহলে স্বপ্ন দেখছিলাম? বাত মাত্র একটা। কিন্তু এ ভাবে আব কতদিন বাঁচব? আমাব জীবনের গতি কি কিরিয়ে ফেলতে পারি না? আমি কি পাবি না এই

দারুণ ছঃস্পের অভিশাপ চিরতরে কাটিয়ে উঠতে ? পারি, যদি চিরদিনের জন্তে সব আশা ত্যাগ ক'রে, অকপটে আত্মসমর্পণ করি আমার দুর্বাব নিয়তির কাছে। কিন্তু তারপর ? আমার এতদিনের পরিশ্রম কি বৃথা যাবে ? আমি কি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকব না, যেখান থেকে আমি আমার এই অশুভ পরিক্রমা প্রথম আরম্ভ করেছিলাম ? না, সে অসম্ভব। যতদিন বাঁচব ততদিন আশা ছাড়ব না — ছেলেকে খুঁজে বার করতেই হবে !

কিন্তু আজ রাত্রেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাঁর মুখ যদি আবার দেখতে হয় এবং আবাব তাঁর মুখ থেকে শুনতে হয় “ওগো, আমি তোমায় ক্ষমা কবেছি,” তাহলে ? না, তা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। ওঃ ! যদি জানবার কিছুমাত্র উপায় থাকত, এই পৃথিবীর পরপাবে অপর একটি পৃথিবী আছে কিনা ? মানুষের জন্মান্তরবাদ কি সত্যি, না মানুষ মরে গিয়ে ধোঁয়ায় মিশে যায় ? কে বলতে পারে সে কথা ? কেউ কি বলতে পারে না ?

এইযে জীবন, এ কতই না বিচিত্র ! এ যেন সূচ, ফুঁরে ফুঁরে স্তম্ভপুণে সূচের কাজ ক'রে চলেছে। হাতে সূতো ধরাই আছে। একটি মাত্র ভুল কবেছ কি, আর রক্ষা নেই, ক্ষমা নেই। কোন রকম মেরামতী চলবে না, দামী সূচের গোটা কাজটায় নষ্ট হয়ে যাবে !...কিন্তু ভুল ? সত্যিই আমি ভুল করেছিলাম কি ? কতখানি দায়ী ভিলাম আমি নিজে, সেই ভুলের জন্তে ? হাঁ ! তখন যদি আমার আর পাঁচ ক্রোণার বেশী থাকত, তা'হলে আজ আর এ দুর্দশা হ'ত না। মাত্র পাঁচ ক্রোণার ! হাসপাতালের

দেনা তখন কোন গতিকে যদি মেটাতে পারতাম !, কিন্তু আব কখনই সে জীবন ফিরে পাব না।

এখন আমি এখানে পড়ে আছি, ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনো কিছুটা আশা বাকী আছে। আরও কিছুদিন ধৈর্য ধবে থাক। দরকাব হয়ত আগামীকাল সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাবপব ? তাবপব সব কিছু, গ্লানি ভুলে গিয়ে আমি সকলকে ধন্যবাদ দেবো—সকলকেই প্রশংসা কবব।

কিন্তু এখন যে আমি এখানে শুয়ে শুয়ে সময় নষ্ট করছি, শিশুটি যদি সত্যিই সেই ধম যাজকটিব কাছে থেকে থাকে ? হয়ত সে সাংঘাতিক অন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছে, কে বলতে পারব, আজই তার মৃত্যু হবে কিনা। আব আমি কিনা এখানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটাচ্ছি ? ওঃ, আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাব।

রেগিণা রিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ঘণ্টা বাজাল। তাড়াতাড়ি সে জামা কাপড় পড়ে নিলে। আবার সে ঘণ্টা বাজালে . আবাব। বহুকণ পরে একজন পরিচারিকা এসে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল।

“এখুনি একখানা গাড়ী ডেকে দাও।”

“গাড়ী ? এখন ?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ যে রাত্রিকাল তা’ আমি জানি। দরকার হ’লে ডবল ভাড়া দেবো। কিন্তু গাড়ী আমাব এখুনি চাই, যেমন করে হোক।”

অল্পকণ পরেই গাড়ীর চাকার ঘর্ষর শব্দে সেই নৈশ নীরবতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

